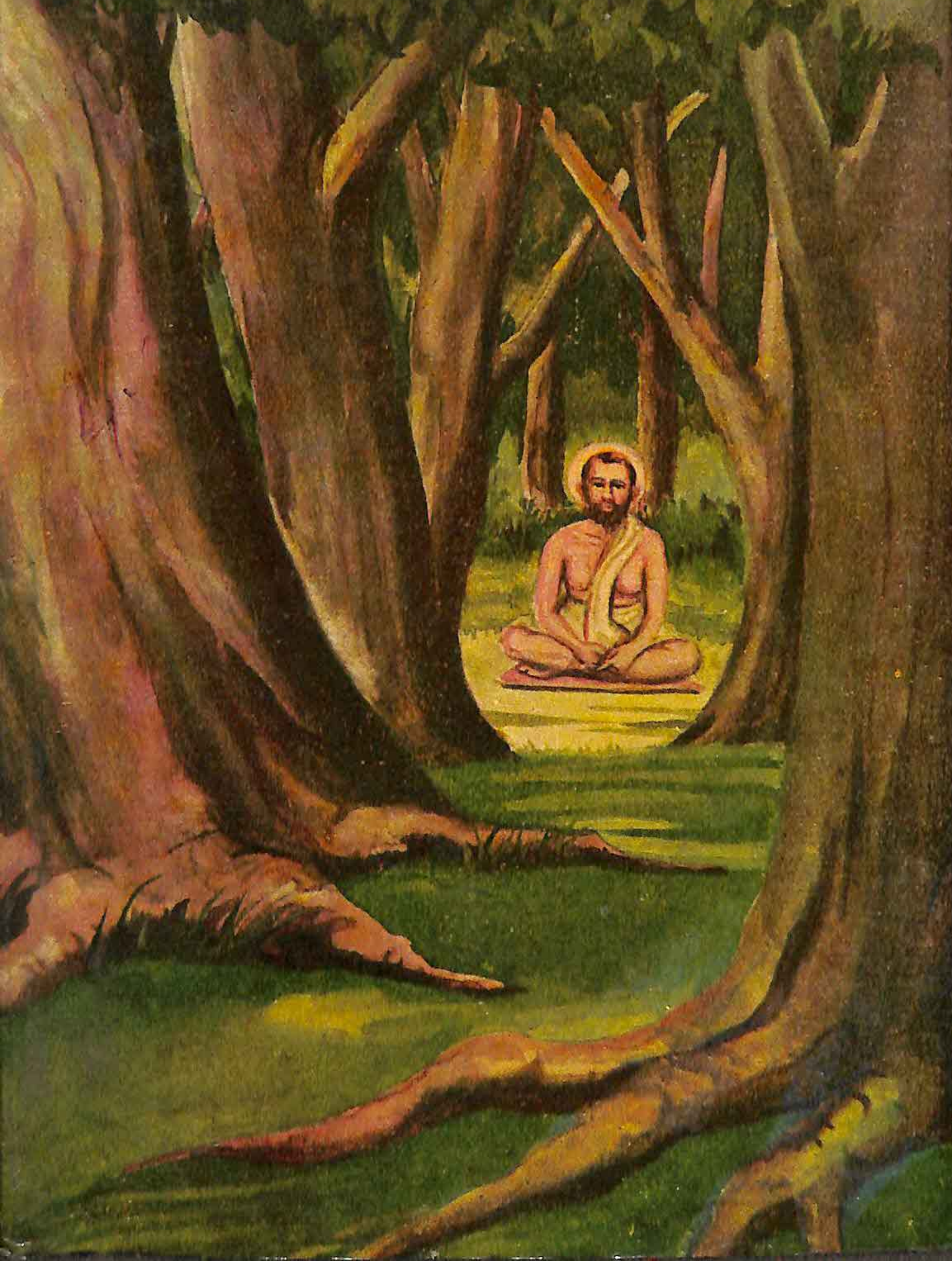
ছোটদের কথামৃত



পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধ জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে প্রকাশিত

ছোটদের কথামৃত

[পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কথিত]

স্বামী স্বরূপানন্দ সম্পাদিত

এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং • বাসী পুস্তকালয়
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট • কলিকাতা ৯ ১১এ কলেজ স্কোয়ার • কলিকাতা ১২

CHOTODER KATHAMRITA by Swami Swarupananda.
A collection of stories based on **Ramkrishna Kathamrita**.

প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৭
পুনঃমুদ্রণ : ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ : নির্মল দত্ত

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা : রণেন গুপ্ত
সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : বার টাকা মাত্র

সোমা প্রকাশনের পক্ষে শ্রীমতী শিখা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শঙ্কর প্রেস, ৩২, বিডন রো, কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা

জননীকে—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমৎ পরেশচন্দ্র রায়মৌলিক

রণেন গুপ্ত

সুজিত নাগ

শ্রীমতী রুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসেস প্লেট



সূচীপত্র



সূচীপত্র



সূচীপত্র



সূচীপত্র

কৈফিয়ৎ

আর একটা কথামৃত? একই সুরে অবিরাম বাজনা বাজালে ভালো লাগবে নাকি কারুর? কান যে ঝালাপালা হয়ে যাবে। আর, পরম পুরুষের সঙ্গে ছিলেন যিনি, তিনি যে 'কথামৃত' লিখে গিয়েছেন, সেটা ফেলে এই কথামৃত পড়তে ভালো লাগবে?

এই বই লেখার সময় প্রথমেই এসব প্রশ্ন মাথায় রাখা হয়েছিল। অস্বীকার করি না, বাজারে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'-র অনেকগুলি সংস্করণ আছে, কিন্তু দশ থেকে আঠারো বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য সেই বইগুলি নয়। বড়দের জন্য লেখা, অতএব বড়রাই কেবল রস উপভোগ করবে—এই তত্ত্ব আমরা মানি না। বড়দের বই বড়দের জন্য থাকুক, ছোটদের জন্য তাদের উপযোগী করে তাদের মনোমত ভাষায় আলাদা কথামৃত লেখা হোক, এই ইচ্ছে আমাদের ছিল। এমন একটা মহাগ্রন্থের স্বাদ ছোটরাও উপভোগ করুক—এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলাম।

আর দশজন মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রচারক যেভাবে গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন, রামকৃষ্ণদেবও তাঁর উপদেশগুলি দেবার সময়ে আশ্রয় নিতেন গল্পের। তবে, রামকৃষ্ণদেবের গল্প বলার ধরণটাই ছিল আলাদা। খুব সাদামাটা মানুষজন, জীবজন্তু বা দেবতাদের নিয়ে গল্প—কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিটি ছিল এত সুন্দর, আর তার শেষও হয়েছে এমন সরসভাবে যে, নামকরা গল্প-বলিয়ে সাহিত্যিকও অবাক হয়ে যাবেন। রামকৃষ্ণদেবের এই অসাধারণ গুণটিকেই আমরা এই বইয়ে কাজে লাগিয়েছি, আমরা তাঁর অন্য সব কথাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গল্পগুলিকেই এ বইয়ের বিষয়বস্তু করেছি। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' হল দুধ, মনকে উন্নত করার যাবতীয় ভিটামিন আর প্রোটিন তার মধ্যে আছে। আমরা সেই দুধকে জ্বাল দিয়ে শুধুমাত্র গল্পগুলোকে নিয়ে ক্ষীর তৈরি করার চেষ্টা করেছি। ক্ষীর ছেলে-বুড়ো সকলের পছন্দ, তাই ভরসা রাখি, এ বই ছোটদের জন্য লেখা হলেও বড়রাও বইটি পড়ে সমান আনন্দ পাবেন।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন: জ্ঞানী হও, বড় হও। বোধ হয় এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট অথচ সবচেয়ে বড় উপদেশ। আলো তো জ্ঞানীর কাছেই, নইলে দুনিয়া অন্ধকার। আগে জ্ঞান লাভ করা, তারপর তো বড় হওয়া। মানুষ সারা

জীবনই শেখে, তবে ছোট বয়সটাই হল তার জ্ঞানলাভের সেরা বয়স। সরস গল্পের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণদেব বড়দের যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, ছোটরাও তা জানুক—সব বুঝতে না পারুক অন্তত শুনে রাখুক—এই ভাবনায় আমরা প্রতিটি গল্পের উপদেশটিকে সংক্ষেপে দিয়ে দিয়েছি, যাতে কিশোর পাঠক-পাঠিকা মূল্যবান কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

এ বইয়ের স্রষ্টা যিনি, সেই রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নতুন করে কি বলার আছে? ব্যাঙ সাগর সম্বন্ধে কি কথা বলবে? পিঁপড়ের বিরাট পৃথিবী সম্বন্ধে কি কথা বলার থাকতে পারে? সূর্যের বর্ণনা আমরা দেব কিভাবে? এক এক জনের কাছে সূর্য দেখা দেয় এক এক রূপে। রামকৃষ্ণদেব সেই সূর্য, তাঁকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা কজনের আছে? ক্ষমতা সীমিত, তবু বামনেরও তো চাঁদে হাত দেবার ইচ্ছে জাগে। ঐ দীপ্তিমান মহামানবকে বোঝার পক্ষে এই বইয়ে দেওয়া তেষট্টিটি গল্পই যথেষ্ট নয় তা জানি, তবু আশা রাখি, পূর্ণকে না বুঝুক কিশোর-কিশোরী অন্তত খণ্ডাংশকে তো বুঝতে পারবে। খণ্ড খণ্ড থেকেই তো পূর্ণ। কে জানে, আজ যে কিশোর-কিশোরী নুড়ি পাথর পেল, ভবিষ্যতে এর থেকেই সে পরশ পাথর কুড়িয়ে পাবে। বিন্দু বিন্দু জল সিন্ধু তৈরি করবে। রূপসাগরে ডুব দিতে দিতে অরূপরতনের সন্ধান মিলবে।

তাই বলছি, আর একটা কথামৃত হলেও একই সুরে বাজনা আমরা বাজাই নি। ঢাক হয়ত এক, কিন্তু আমাদের ঢাকের কাঠিটি যে আলাদা, এ বইয়ের কয়েক পাতা ওলটালেই তা বোঝা যাবে। আমরা কেবল গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করেছি। পরমপুরুষ আমাদের জ্ঞানদীপ। তাঁর গল্প আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে ফুটিয়ে তুলুক।

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৭ — বিনয়াবনত,

কলকাতা — **স্বামী স্বরূপানন্দ**

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

শঙ্করের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক, রামানুজ আর চৈতন্যের বিশাল হৃদয়। এখন এমন একজনের আবির্ভাবের সময় হয়েছিল যাঁর মধ্যে একাধারে এরকম মস্তিষ্ক ও হৃদয় থাকবে; যিনি একাধারে শঙ্করের বিরাট মেধা এবং চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হবেন। যিনি দেখবেন, সব সম্প্রদায় একই মহৎ ভাবে, এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত, যিনি সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবেন; যাঁর হৃদয় ভারত বা ভারতের বাইরের দুর্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদবে; আবার একই সঙ্গে যাঁর বিশাল বুদ্ধি এমন সব মহান তত্ত্বের উদ্ভাবন করবে যেগুলো ভারত ও ভারতের বাইরের সমস্ত পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে; আর এ রকম বিস্ময়কর সমন্বয়ের ফলে এমন এক বিশ্বজনীন ধর্মের প্রকাশ সম্ভব হবে যার মধ্যে হৃদয় এবং মস্তিষ্কের পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকবে। এই রকম এক ব্যক্তি সত্যিই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েক বছর তাঁর চরণতলে বসে শিক্ষা লাভ করবার। এ রকম একজন মানুষের আবির্ভাবের সময় হয়ে এসেছিল, প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল; তিনিও এসেছিলেন। এবং সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তাঁর জীবন কেটেছিল এমন একটা শহরের কাছে, যে শহর পাশ্চাত্য ভাবের পেছনে উন্মত্ত হয়ে ছুটছিল, ভারতের অন্য যে কোন শহরের চেয়ে যা বেশি পরিমাণে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়েছিল। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর কিছুই ছিল না। মহামনীষাসম্পন্ন হয়েও তিনি নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারতেন না, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী স্নাতকরা পর্যন্ত তাঁকে দেখে একজন মহামনীষী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একজন অদ্ভুত মানুষ ছিলেন—এই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

এই মানুষটি কলকাতার উপকণ্ঠে এসে রইলেন। কলকাতা হল ভারতবর্ষের রাজধানী। আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-নগরী এই শহর —যেখান থেকে প্রতি বছর শত শত সংশয়বাদী ও জড়বাদী যুবক বেরিয়ে আসছিল। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব উপাধিধারী সংশয়বাদী ও নিরীশ্বর-বাদীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কথা শুনতে আসত। আমি এই মানুষটির সম্বন্ধে শুনলাম এবং একদিন গেলাম তাঁর কথা শুনতে। তাঁকে দেখে অতি-সাধারণ বলে

মনে হল। কোন অসাধারণত্বই চোখে পড়ল না। একেবারে সহজ ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন। আমি ভাবলাম 'এই লোকটি কি করে একজন বড় ধর্মাচার্য হতে পারেন?' আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই প্রশ্ন করলাম যা আমি সারা জীবন ধরে অন্যদের করে এসেছি: 'আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?' তিনি উত্তর করলেন: 'হ্যাঁ।' 'আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে, ঈশ্বর আছেন?' 'হ্যাঁ।' 'কি প্রমাণ?' 'আমি তোমাকে যেমন আমার সামনে দেখছি, তাঁকেও ঠিক সেই রকম দেখি, বরং আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বলভাবে।' এই কথা শুনে আমি মুগ্ধ হলাম। এই প্রথম আমি এমন একজনকে দেখলাম যিনি সাহস করে বলতে পারেন, 'আমি ঈশ্বর দেখেছি, ধর্ম সত্য, ধর্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব—আমরা এই জগৎকে যেমন প্রত্যক্ষ করি, তার চেয়েও অনন্ত গুণ স্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে।' আমি দিনের পর দিন সেই লোকটির কাছে যেতে শুরু করলাম।

……ধর্ম যে দেওয়া যেতে পারে, তা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম যে, একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।……আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

আমার আচার্যদেবের কাছ থেকে আমি বুঝেছি যে, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তাঁর মুখ থেকে কখনও কারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নি, কোন সমালোচনা পর্যন্ত নয়। তাঁর দৃষ্টি জগতে কোন কিছুকে মন্দ বলে দেখবার শক্তি হারিয়েছিল—তাঁর মন কোন রকম কুচিন্তা করবার সামর্থ্য হারিয়েছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র নিগূঢ় উপায়।

ত্যাগ ছাড়া আধ্যাত্মিকতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সমস্ত ধর্মভাবের পেছনেই রয়েছে ত্যাগ—তা যেখানেই হোক না কেন। আর এই ত্যাগের ভাব যতই কমে যায়, ততই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ধর্মের ভেতরে ঢুকতে থাকে; আর ধর্মভাবও সেই অনুপাতে কমে যায়। এই মহাপুরুষ ত্যাগের সাকার বিগ্রহ ছিলেন।

যাঁরা সন্ন্যাসী হন, তাঁদের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্য-মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করতে হয়। আর আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কাজে পরিণত করেছিলেন। এমন অনেকে ছিল,যাদের কিছু থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করলে তারা কৃতার্থ বোধ করত। যারা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে হাজার হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিল—কিন্তু এই মানুষটি যদি কখনও কারও কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত

হতেন, তারা হচ্ছে এই লোকগুলি। সম্পূর্ণভাবে কাম-কাঞ্চন জয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি। এই দুই ভাব তাঁর ভিতর বিন্দুমাত্রও ছিল না ; আর বর্তমান শতাব্দীর জন্য এ রকম মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

আমরা পাশ্চাত্যে নারীপূজার কথা শুনে থাকি, কিন্তু সাধারণত এই পূজা নারীর সৌন্দর্যের ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলতে বুঝতেন—মা আনন্দময়ীর পূজা। সব নারীই সেই আনন্দময়ী মা ছাড়া আর কিছু নন। আমি নিজে দেখেছি, সমাজ যাদের স্পর্শ করে না—এরকম স্ত্রীলোকদের সামনে তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শেষে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পদতলে পড়ে অর্ধবাহ্যদশায় বলেছেন, 'মা, এক রূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ, আর এক রূপে তুমি এই জগৎ হয়েছ। আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি।' ভেবে দেখুন, সেই মানুষটির জীবন কিরকম ধন্য—যাঁর অন্তর থেকে সব রকম পশুভাব চলে গেছে, যিনি প্রতিটি নারীকে ভক্তিভাবে দর্শন করেন, যাঁর চোখে সব নারীর মুখ অন্য রূপ ধারণ করে সেই আনন্দময়ী জগন্মাতার মুখই কেবল প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ……যদি প্রকৃত ধর্মলাভ করতে হয় তাহলে এই রকম পবিত্রতাই আমাদের সর্বতোভাবে প্রয়োজন।

তাঁর জীবনের আর একটি ভাব হচ্ছে, অপরের প্রতি গভীর প্রেম। আমার গুরুদেবের জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারে, আর দ্বিতীয় ভাগ কেটেছে তা বিতরণে।……মানুষ ভিড় করে তাঁর কাছে আসত তাঁর কথা শুনতে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। এরকম যে দু-এক দিন হয়েছিল তা নয়—মাসের পর মাস এ রকম হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এই কঠোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে গেল। কিন্তু তাঁর গভীর মানবপ্রেম তাঁকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দিল না ; প্রত্যাখ্যান করল না কাউকেই—এমন কি তাঁর উপদেশপ্রার্থী হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দীনতম যে, তাঁকেও নয়। ক্রমে তাঁর গলায় মারাত্মক রোগ দেখা দিল। তবুও অনেক বুঝিয়েও তাঁর কথা বলা বন্ধ করা গেল না। যখনই তিনি শুনতেন, লোকে তাঁকে দেখতে এসেছে, তিনি তাদের তাঁর কাছে আসতে দেবার জন্য জোর করতেন এবং তারা এলে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কেউ বোঝাতে এলে বলেছিলেন : 'দেহের কষ্ট আমি গ্রাহ্য করি না। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি। একজন লোককে সাহায্য করতে পারাও গৌরবের ব্যাপার।'

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল

মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয়নি ; সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে ; অথচ প্রত্যেকে তাঁকে নিজের ভেবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—কেউ আচার্য, বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ বা আদর্শ পুরুষ—যার যা খুশি।

… …রামকৃষ্ণ পরমহংস সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পরিপূর্ণ—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট ; কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয় ? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস দাস-দাসোহহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস ?

যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেই দিন থেকেই আধুনিক ভারত—সত্যযুগের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিস নি। সমগ্র হিন্দু জাতি যুগ যুগ ধরে যে চিন্তা করে আসছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমস্ত ভাব উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সব জাতির শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য।

ভারত দীর্ঘদিন যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানদের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। পতিত ভারতবর্ষ আবার জেগে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারতবর্ষ উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারদিকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দু সমাজের সর্বাংশে—প্রতি অণু-পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাব ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এই কাজ করবে ? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে ? কে নাম, যশ, ঐশ্বর্যভোগ—এমন কি ইহলোক-পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ করতে এগোবে ? প্রভু যাকে মনোনীত করবেন, সে-ই মহাগৌরবের অধিকারী।

রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভেবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে।



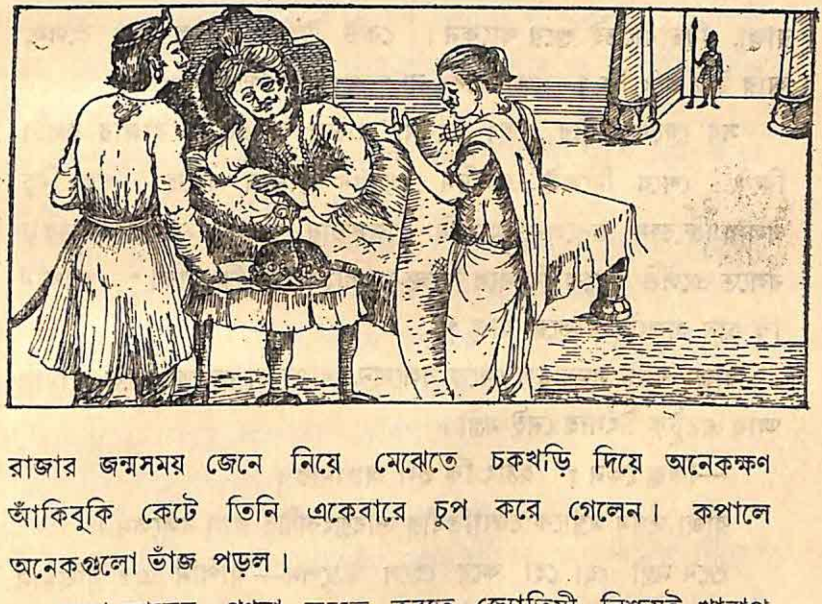


॥ বড় ভুল ॥

এক জ্যোতিষীর গল্প বলি।

এক রাজার বড় সাধ হল, আর কত দিন তিনি রাজত্ব করবেন তা জানার। তাই ডেকে পাঠালেন রাজ্যের সেরা জ্যোতিষীকে।

প্রৌঢ় জ্যোতিষী এলেন। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, কাঁধে ঝোলা। সেই ঝোলায় কয়েকটা পাঁজিপুঁথি আর গুটিকয়েক চকখড়ি।



রাজার জন্মসময় জেনে নিয়ে মেঝেতে চকখড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ আঁকিবুকি কেটে তিনি একেবারে চুপ করে গেলেন। কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল।

রাজা বুঝলেন, গণনা করতে করতে জ্যোতিষী নিশ্চয়ই খারাপ কিছু পেয়েছেন, তাই তাঁর কপালে অমন চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। উদ্বেগের সুরে তাই জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছেন বলুন।

জ্যোতিষী একটু থেমে বললেন, মহারাজ, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে।

—নির্ভয়ে বলুন।

—আপনার সময়টা এখন ভালো যাচ্ছে না। খুব বিপদ আছে সামনে।

অজানা একটা ভয়ে রাজার মুখ শুকিয়ে গেল এবার। গলা যেন শুকনো কাঠ হয়ে গেল, আওয়াজ আর বেরোতে চায় না। তবু কোনরকমে বললেন, কি বিপদ ?

—আপনি ছ মাসের বেশি বাঁচবেন না।

শুনে রাজা তো মিইয়ে গেলেন। তাঁর এই সুন্দর রাজ্য, এত সাধের রাজত্ব, এমন বিলাসী জীবন—এসব তিনি ভোগ করবেন আর মাত্র ছ মাস ? ছ মাস আর কটা দিন ?

মনের দুঃখে রাজা নাওয়া-খাওয়া প্রায় ত্যাগ করে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। রাজসভায় আর আসেন না।

মন্ত্রীও ব্যাপারটা খেয়াল করলেন। রাজসভায় আর আসেন না রাজা, বিছানাতেই শুয়ে থাকেন। কেউ উঠতে বললে শুধু বলেন, আর উঠে হবে কি ? তোমাদের যা খুশি করো গিয়ে।

সব দেখে মন্ত্রীর তো ভাবনা বাড়ল আরও। রাজার হলটা কি ? শেষে নিজেই একদিন গেলেন রাজার কাছে। খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রাজসভায় যাচ্ছেন না, কেউ কিছু বলতে এলেও তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, ব্যাপারটা কি রাজা ? আপনি কি চান রাজ্যটা উচ্ছন্নে যাক ?

রাজা একটু সময় চুপ থেকে বললেন, রাজ্য বা রাজত্ব সম্বন্ধে আমার আর এতটুকু উৎসাহ নেই মন্ত্রী।

—কিন্তু কেন ? হঠাৎ কি হল আপনার ?

রাজা তখন মন্ত্রীকে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণীর কথা বললেন।

শুনে মন্ত্রী হো হো করে হেসে উঠলেন—আপনি এত বুদ্ধিমান হয়ে এক জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করলেন ?

রাজা বললেন—না, মন্ত্রী, জ্যোতিষীকে অমন ছোট করে দেখো না। ও যা বলে, নির্ভুল বলে। বহু লোকের ভবিষ্যৎ গণনা করেছে। যাকে যা বলেছে তাই হয়েছে। তাই তো ওর কথা উড়িয়ে দিতে পারছি না।

মন্ত্রী নানাভাবে রাজাকে বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দেখলেন, রাজার মনে কথাটা একেবারে স্থির ভাবে গেঁথে গেছে,

তিনি ছ মাসের বেশি বাঁচবেন না। রাজার মন থেকে এই বিশ্বাসটা দূর করতে হলে অন্য উপায় গ্রহণ করা ছাড়া পথ নেই।

অনেক ভেবে মন্ত্রী রাজাকে বললেন, আপনার কথাই আমি মানছি মহারাজ। তবে, একটা কথা। ভুল তো সকলেরই হতে পারে। এই জ্যোতিষীও যে তাঁর গণনায় ভুল করেন নি, তারই বা প্রমাণ কোথায়। তাই আমি বলি, আবার ঐ জ্যোতিষীকে ডাকুন, ফের গণনা করতে বলুন।

মন্ত্রীর কথায় রাজা ফের জ্যোতিষীকে রাজসভায় ডাকলেন।

জ্যোতিষী এলেন। সব শুনে ফের রাজার ভাগ্য বিচার করতে বসলেন। কখনও রাজার হাত দেখলেন, কখনও মেঝেতে চকখড়ি দিয়ে ছক কেটে আর অঙ্ক কষে কি সব মেলাতে লাগলেন। রাজসভায় তখন সীমাহীন নীরবতা। আর সকলের সঙ্গে রাজা এবং মন্ত্রীও অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন জ্যোতিষীর দিকে।

অঙ্ক কষা শেষ করে জ্যোতিষী রাজার দিকে তাকাতেই রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলেন?

জ্যোতিষী মুখ গম্ভীর করে বললেন, না মহারাজ! আমার হিসেবে কোন ভুল নেই। আপনার পরমায়ু সত্যিই আর ছ মাস।

রাজার মুখখানা এবার আরও শুকিয়ে গেল। মন্ত্রী তাই দেখে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, একটা কথা—

জ্যোতিষী মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বলুন।

—আপনার পরমায়ু কত বছর?

—আমার? আজ্ঞে, আমি আরও বারো বছর·····

কথাটা শেষ করতে পারলেন না জ্যোতিষী। তার আগেই নিজের কোমরের খাপ থেকে তরোয়ালখানা বের করে মন্ত্রী সকলের সামনেই এক কোপে উড়িয়ে দিলেন জ্যোতিষীর মাথা। তারপর রাজার দিকে চেয়ে বললেন, লোকটা কত বড় মিথ্যেবাদী দেখেছেন মহারাজ? এই মুহূর্তেই ওর পরমায়ু শেষ হয়ে গেল, অথচ বলে কিনা আরো বারো বছর বাঁচবে! ওর কথায় বিশ্বাস করলে কত বড় ভুল হতো, দেখুন তো মহারাজ!

[মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারেন কেবল ভগবান। মানুষের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়।]



ভয় কিসের ?

দিগ্বিজয়ী বিদেশী সম্রাট ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। নিজে যেমন সাহসী, তেমনি বীর তাঁর সেনাদল। একের পর এক ভারতীয় রাজ্য আক্রমণ করে চলেছেন। তাঁর সৈন্যদের বীরত্বের কাছে বিপক্ষের সৈন্যদল তৃণের মত উড়ে যাচ্ছে। একের পর এক রাজ্য দখল করছেন সম্রাট। খুব খুশি তিনি।

এমন এক খুশির দিনে হঠাৎ সম্রাটের মনে পড়ে গেল গুরুর



কথা। ভারতবর্ষ আক্রমণ করার আগে তিনি যখন গুরুর কাছে আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিলেন, তখন গুরু বলেছিলেন, যদি পারো তো ভারতীয় সাধুদের সঙ্গে দেখা কোরো।

গুরু জ্ঞানী। তিনি যখন বলেছেন, তখন তাঁর কথা শুনতেই হবে। যুদ্ধের তাড়নায় কথাটা এতদিন মনে ছিল না, এখন যখন মনে পড়েছে, তখন খোঁজ করতে হয় ভারতীয় সাধুদের।

রাজ্যজয়ের নেশায় সামনের দিকে এগিয়ে চললেও সম্রাটের চোখ কিন্তু সাধুর খোঁজেই ব্যস্ত। অবশেষে আকুল খোঁজের অবসান হল। সম্রাট সত্যিই এক সাধুর দেখা পেলেন। একটা

ছোট্ট পাথরের ওপর তিনি চোখ বুঁজে বসে। মাথায় জটাজুট, পরণে একটি কৌপীন ছাড়া আর কিছু নেই। দু চোখ বোঁজা থাকলেও সারা মুখ জুড়ে একটা প্রশান্তির ছাপ—মনে হল সাধুর যেন কোন দুঃখ নেই, ভয় নেই, রাগ নেই, বিরাগ নেই, অনুতাপ নেই।

সম্রাট আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এত দেশ তিনি ঘুরেছেন, এত মানুষজন দেখেছেন, কিন্তু কই, এমন শান্ত মুখমণ্ডলের অধিকারী একটি মানুষও তো তাঁর চোখে পড়ে নি! দুনিয়ার সব দুঃখজ্বালা বুঝি ভুলে যাওয়া যাবে এই মানুষটির সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে। এঁকেই সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যাক না কেন।

ভাবামাত্র কাজ করতে অভ্যস্ত সম্রাট। অমনি সাধুজীকে ডাক দিলেন। চোখ আর খোলেন না তিনি। অনেক ডাকাডাকির পর চোখ মেলে সম্রাটের দিকে তাকালেন সাধু।

—বল।

সাধুর মুখ তেমনি প্রশান্ত। ঠোঁটের দু কোণে মিষ্টি হাসির ছোঁয়া লাগানো।

সম্রাট দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন—আপনাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব।

—কেন বাবা?

—আপনাকে আমায় খুব ভালো লেগেছে। আমার গুরু আদেশ দিয়েছিলেন ভারতীয় সাধুদের সঙ্গে আলাপ করতে। আপনার দর্শন পেয়েছি, খুব ভালো লাগছে। আপনি চলুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে আরামে রাখব, কোন দিকে এতটুকু অসুবিধে হবে না আপনার।

সম্রাটের কথা শুনতে শুনতে সাধুর দুই ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসির একটা রেশ ছড়িয়ে গেল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আগের মতই শান্তভাবে বললেন—না বাবা, আমার পক্ষে তোমার রাজসভায় যাওয়া সম্ভব নয়। আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।

একটু চমকিত হলেন সম্রাট। লোকটার মাথা ঠিক আছে তো? নিয়ে যেতে চাইছি রাজসভায়, থাকবেন কত আরামে—তা

নয়, বলছেন কিনা, বনেই আরামে আছেন! রোদ-জল-বৃষ্টি, তার ওপর হিংস্র জীবজন্তুর ভয়, বন থেকে ফলমূল পেড়ে এনে খাওয়া—একে বলে আনন্দ! আজব ব্যাপার!

রাজার কেমন যেন জিদ চেপে গেল। এত রাজ্য তিনি জয় করেছেন, সারা তুনিয়া তাঁর পদানত, আর এই সাধু কিনা তাঁরই কথা রাখবেন না? যতবার তিনি সাধুকে অনুরোধ করছেন, ততবারই সাধু বলছেন—না বাবা। আমার রাজসুখের দরকার নেই, আমি এই বনে বেশ আরামেই আছি।

তরবারির খাপের ওপরে হাত রাখলেন রাজা। শেষবারের মত জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আপনি যাবেন না?

—না রাজা, তুমি কিছু মনে করো না, এই বন ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

শুনে সম্রাটের মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। কৌপীন পরা এক সাধুর এত অহঙ্কার? ইচ্ছে করলে এই তরবারি দিয়ে এক কোপে তিনি সাধুর মাথা নামিয়ে দিতে পারেন। কোনরকমে নিজের রাগ সামলে বললেন, জানেন আমি কে?

সাধু মাথা নাড়লেন—না বাবা, জানি না।

—আমি পৃথিবীর সম্রাট। আপনাকে ধন দেব, পদমর্যাদা দেব, সভাসদ করে আপনাকে সুখে রাখব। আপনাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

সাধু নির্বিকারভাবে বললেন—না বাবা, ওসব সুখ ঐশ্বর্য্য আমার চাই না। আমি এখানেই বেশ সুখে আছি। আমি কোথাও যাব না।

এবার সম্রাটের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। কোষ থেকে ঝকঝকে ধারালো তরোয়ালখানা বের করে উঁচিয়ে ধরে বললেন—আপনি যদি না যান, তাহলে আপনাকে আমি খুন করব।

সম্রাটের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন সাধু—এতক্ষণ পরে তুমি মূর্খের মত কথা বললে রাজা। তুমি আমায় মারবে বললে? কিন্তু মারবে তো এই শরীরটা, আমার আত্মাকে তুমি কেন, কেউ মারতে পারবে না। আত্মার তো কোন ক্ষয় নেই, মৃত্যু

নেই রাজা। সূর্য তাকে শুকোতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, কোন যন্ত্র তাকে কাটতে পারে না। মানুষের সাধ্য কি আত্মার বিনাশ ঘটায়? তাই তোমাকে আবার ভয় কিসের?

সম্রাট হাঁ করে সাধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখে তখনও হাসি।

[যিনি ভগবানের সাধনা করেন, কোন ভয়ই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।]



।। ফোঁস করাও দরকার ।।

পোড়ো মন্দিরের পুরনো বটগাছের ফোঁকরে বাস করত এক বিষাক্ত সাপ। শান্তিতে থাকবে বলে জায়গাটাকে বেছে নিয়েছিল সে, কিন্তু পাড়ার বাচ্চা ছেলেগুলোর জ্বালায় চুপ থাকার যো কি। সারাটা দুপুর ঐ বটগাছের চারপাশে হুড়োহুড়ি দাপাদাপি করে, ফোঁকরটার ভেতরে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে, সেখানে ইট-পাটকেল



গুঁজে দিয়ে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলল তারা সাপটাকে। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে সাপ তখন ফোঁকর থেকে বেরিয়ে একটা ছেলেকে ছোবল মারল। ছেলেটা তো তখুনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাই দেখে অন্যেরা লাগাল ছুট।

সেই সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সন্ন্যাসী। ছেলেটাকে লুটিয়ে পড়তে দেখে এগিয়ে গেলেন তার কাছে। সাপের বিষে নীল হয়ে আসছে তার শরীর। সন্ন্যাসী বিষ বের করার মন্ত্র জানতেন। তখুনি তিনি মন্ত্র পড়ে কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন ছেলেটির গায়ে। ছেলেটা বিষমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিছু দূরে সেই ফোঁকরের মুখে চোখ রেখে সাপটা সব দেখল। রাগে তখনও জ্বলছে তার শরীর। যে রকম জ্বালিয়েছে ছেলেগুলো, তাতে একটাকে কেন, সবগুলো ছেলেকে কামড়ালে গায়ের জ্বালা মিটত। এমন দুষ্টু ছেলেগুলো যে ঘুমোনো তো দূরের কথা, তাকে একটু বিশ্রাম পর্যন্ত নিতে দেয় না। সেই ছেলের আবার বিষ নামিয়ে দিলেন সন্ন্যাসী!

সাপ দেখল, ছেলেটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছেন সন্ন্যাসী। ভালো মানুষ, সাপ তাঁকে দেখেই ফণা নামাল। তারপর বলল—কিছু বলবেন প্রভু?

—হ্যাঁ। ছেলেটিকে তুমি কামড়েছ?

—কি করব প্রভু। আমি তো শান্তিতে থাকব বলে এই বটগাছটার ফোঁকরে বাসা বেঁধেছিলাম। তা ছেলেগুলোর জ্বালায় একটু বিশ্রাম নিতে পারি না, ঘুম তো দূরের কথা। আজ অত্যাচার সীমা ছাড়িয়েছিল, তাই একটা ছেলেকে কামড়েছি।

সন্ন্যাসী মাথা নাড়েন—কাজটা তুমি ভালো করো নি। হিংসা ভালো নয়, তোমাকে হিংসা ত্যাগ করতে হবে।

সাপ সন্ন্যাসীর সামনে মাথা নামিয়ে বলল—আপনি আদেশ দিলে তাই করব সাধুজী।

সন্ন্যাসী খুশি হলেন। সাপকে মন্ত্র দিয়ে বলে গেলেন কিভাবে থাকবে সে। সাপ মাথা নেড়ে বলল—তাই হবে প্রভু।

এরপর দিন যায়। বেশ কিছুদিন ভয়ে ভয়ে থাকার পর ছেলের দল আবার ঐ বটগাছের কাছে এসে খেলতে শুরু করল। প্রথম প্রথম তারা বটগাছের সামনে যেতো না, দিন কয়েক পরে তাদের সে ভয় ভাঙ্গল। সাপকে দেখা যায় গাছের ফোঁকরের মধ্যে। ছেলের দলের মাথায় আবার দুষ্টুমি বুদ্ধি চাপে। তাদের একজন একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে ফোঁকরের ভেতর। দেখাদেখি অন্যরাও মারে।

সাপটা কিন্তু ঢিল খেয়ে অন্যান্য দিনের মত ফোঁস করে ওঠে না। ব্যথা পেলেও সন্নাসীর কথামত সে হিংসার পথে আর যায় না,

চুপ করে শরীর গুটিয়ে মাথা গোঁজে কুণ্ডলীর ভেতর যাতে মাথায় ঢিল না লাগে।

ঢিল খেয়েও সাপকে কিছু বলতে না দেখে ছেলেদের সাহস বাড়ে। তারা সবাই এবার সাপের দিকে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। কেউ বা লাঠি দিয়ে খোঁচায়। কেউ গুলতি চালায়। এভাবে মার খেয়ে খেয়ে সাপের তো দফারফা হবার দাখিল। তবু সে কিছু বলে না কাউকে।

ক্রমশ ছেলেদের সাহস বাড়ছে। সাপকে বিরক্ত করা এবার তাদের অভ্যাসে দাঁড়াল। গাছের ডাল ভেঙ্গে এবার তারা সাপকে খোঁচা দিতে থাকে। বেচারা সাপ! ডালের খোঁচায় আর ঢিলের আঘাতে তার সারা শরীর রক্তাক্ত, কোমর ভাঙ্গা। এখন তার মরমর অবস্থা।

সন্ন্যাসী আবার একদিন যাচ্ছিলেন ঐ পথ দিয়ে।

সেই বটগাছের কাছে ছেলেদের জটলা দেখে থমকে দাঁড়ান তিনি। ছেলের দল কি করছে? এগিয়ে যান তিনি। ছেলের দল হৈ হৈ করে ওঠে—মজার সাপ সাধুজী, মার খেলেও ফোঁস করে না, কামড়ায় না।

গাছের কোটরে উঁকি মেরে সন্ন্যাসীর চোখ কপালে ওঠে। এ কি! সেই সাপটাই তো, যাকে তিনি হিংসা ত্যাগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু এ কি দশা হয়েছে তার? সারা শরীর রক্তাক্ত, নড়তে পর্যন্ত পারছে না।

সন্ন্যাসীর মনে দয়া এল। ছেলের দলকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সাপের কাছে এলেন। তাকে সেবাশুশ্রূষা করে সারিয়ে তুললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এমন দশা কি করে হল?

সাপ এবার কেঁদেই ফেলল। বলল—ঐ ছেলেগুলোর জন্য প্রভু। ওরা আমায় দিনরাত ঢিল ছুঁড়ছে, গাছের ডাল দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। আমি ওদের ছোবল মারতে পারতাম, কিন্তু ঐ যে আপনি হিংসা করতে বারণ করেছেন, তাই কাউকে কিছু করি নি, মুখ বুঁজে শুধু মার খেয়ে গেছি।

সন্ন্যাসী বললেন—ধুর বোকা! আমি কি তোমায় এভাবে মার খেতে বলেছি নাকি?

—তাহলে? আপনিই তো কামড়াতে বারণ করলেন।

সন্ন্যাসী হেসে উঠলেন—তোমায় কামড়াতে বারণ করেছি, কিন্তু ফোঁস করতে তো বারণ করিনি। দেখতে, ফোঁস করলেই ছেলের দল পালাত, কামড়াবার দরকারই পড়ত না। নিজেকে বাঁচাতে হলে মাঝে মাঝে ফোঁস করে উঠতে হয়, নইলে তো সবাই ঢিল ছুঁড়েই মেরে ফেলবে তোমায়।

[সংসারে বাঁচতে গেলে মাঝে মাঝে ফোঁস করার দরকার হয়।]



।। যত মত, তত পথ ।।

খুব শক্তিশালী এক রাজা আক্রমণ করতে আসছেন একটি ছোট্ট রাজ্য। খবরটা পেয়েই তো ছোট রাজ্যটির রাজার ঘুম গেল। তাঁর দেশ ছোট, সৈন্যসামন্তও কম—তিনি কি করে অমন পরাক্রমশালী রাজার সঙ্গে লড়াই করবেন, এই চিন্তাতেই তাঁর ঘুম ছুটে গেল। তবু, লড়াইয়ে হার হবে বলেই তো আর যুদ্ধ না করে রাজাকে পথ ছেড়ে দেওয়া যায় না। তিনি রাজা—বিপদে তাঁকে স্থির থাকতে হবে, রাজ্যের প্রজারা তো বিপদের দিনে তাঁরই দিকে চেয়ে আছে।

রাজা ঠিক করলেন, রাজ্যের এই বিপদের দিনে বিভিন্ন পেশার বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ নেবেন। রাজার ডাকে সাড়া দিয়ে সভায় এলেন ইঞ্জিনিয়ার, সূত্রধর, চর্মকার, কামার, এমন কি উকিল-মোক্তার, পুরোহিত পর্যন্ত। শুরু হল সভা।

রাজা বললেন—রাজ্যের আজ বড় বিপদ। শত্রু রাজ্যের রাজা আসছেন আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে। ওদের শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। এখন আপনারা বলুন, কি করলে আমরা শত্রুকে রুখতে পারি।

ইঞ্জিনিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—প্রথমে আমাদের রাজধানীকে সুরক্ষিত করা দরকার, যাতে শত্রু কিছুতেই আমাদের মূল শহরকে দখল করতে না পারে। এজন্য আমার পরামর্শ হল, শহরের চারদিকে মস্ত বড় একটা খাল খনন করা হোক। খালটা গোটা শহরকে ঘিরে থাকবে। শত্রুরা সেই খাল পেরিয়ে ভেতরে আসতে পারবে না।

এই কথা শুনে সূত্রধর (কাঠের মিস্ত্রি) বলল—হুজুর, খাল কাটতে অনেক সময় লাগবে, ততদিনে শত্রুরা শহর দখল করে নেবে। তার চেয়ে ভালো হল, গোটা শহরটার বাইরে একটা কাঠের দেয়াল তুলে দেওয়া।

সূত্রধরের প্রস্তাব শোনামাত্র চর্মকার চেঁচিয়ে উঠল—হুজুর, কাঠের চেয়েও মজবুত হবে যদি দেয়ালটা চামড়ার হয়।

প্রতিবাদ করে উঠল কামার—হুজুর, এগুলো সব বাজে প্রস্তাব। তার চেয়ে বরং আপনি শহরের চারপাশে লোহার দেয়াল তুলে দিন। জানেন তো, লোহা কত মজবুত। শত্রুরা যদি গোলাগুলিও ছোঁড়ে, তাহলেও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। লোহার দেয়াল ভেদ করে গোলাগুলি ভেতরে আসতে পারবে না।

এমন সময় উঠে দাঁড়ালেন উকিল। তিনি বললেন—হুজুর, আমার মনে হয় এত সব করার কোন দরকারই নেই। এটা আমাদের রাজ্য। আমাদের রাজ্য দখল করার অধিকার অন্য রাজার নেই। অতএব চলুন, এই সার কথাটা আমরা তর্কযুদ্ধের সাহায্যে শত্রুপক্ষকে বুঝিয়ে দিই, তাহলে ওরা আর ঐ কাজ করবে না।

রাজা প্রত্যেকের কথাই শুনছিলেন, আর প্রতিবারই যেন বেশি ধাঁধাঁয় পড়ছিলেন। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এর মধ্যে কোন্ যুক্তিটা নেবেন।

ঠিক এই সময় উঠে দাঁড়ালেন পুরোহিত। তিনি বেশ কিছু মন্ত্র আউড়ে রাজাকে সম্বোধন করে বললেন—হে রাজন্, এরা সকলেই দেখছি প্রলাপ বকছে। এদের কারুর কথাতেই কিছু কাজ হবে না। তার চেয়ে আমাদের উচিত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা, হোম করে তুলসী দেওয়া—এসব করলে শত্রুরা কিছুই করতে পারবে না।

এভাবে প্রত্যেকেই নিজের মতকেই সেরা বলে জাহির করার চেষ্টা শুরু করলে সভায় শুরু হল গণ্ডগোল। রাজা নিজেও ঠাহর করতে পারলেন না, কোন্ মতটিকে গ্রহণ করলে রাজ্যের উপকার হবে। সিদ্ধান্ত নিতে তাই দেরি হতে লাগল এবং এর মধ্যে শত্রুপক্ষ প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজ্যটি দখল করে নিল।

[কাজ শুরু না করে শুধু বসে বসে জল্পনা কল্পনা করলে সময় চলে যায়, কিন্তু কাজের কাজ আর করা হয় না কোন দিন।]



॥ গঙ্গালাভ ॥

হিন্দুদের কাছে গঙ্গা অতি পবিত্র নদী। গঙ্গায় রোজ স্নান করা, মরে গঙ্গালাভ করা প্রতিটি হিন্দুর কাছেই পরম পুণ্যের ব্যাপার।

যাই হোক, কলকাতার এক ছেলের বিয়ে হল এমন এক পাড়াগাঁয়ে যেখানে গঙ্গা নেই। বিয়ের পর সেই ছেলে গেল শ্বশুরবাড়ি। গিয়ে দেখল, তাকে নিয়ে সকলের আদর-যত্নের শেষ



নেই। যত ভাবে একটা মানুষকে তোয়াজ করা যেতে পারে, তার সব আয়োজনই রয়েছে। দেখে খুব খুশি হল সে।

খেতে বসে প্রথমটায় একটু অবাকই হল ছেলেটি। তার সামনে নানা রকমের লোভনীয় খাবার, কিন্তু তাকে ঘিরে ঢাকঢোল নিয়ে বসে আছে জনকয়েক বাজনদার।

নতুন শ্বশুরবাড়ি, সব কথা সবাইকে জিজ্ঞেস করা যায় না। খাবার সময়ে বাজনদাররা কেন, এ প্রশ্নটা সে কাউকেই জিজ্ঞেস করতে পারল না। শেষে মনে ভাবল, সে যোগ্য জামাই বলেই তাকে নিয়ে শাশুড়ির খুব গর্ব এবং পাড়াপড়শীকে তা জানাতেই হয়ত এসব আয়োজন।

খাবারের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে প্রথমে শাকের দিকে হাত বাড়াল জামাই। অমনি শাশুড়ি বললেন—আগে দুধটুকু খেয়ে নাও বাবা।

জামাই তো অবাক—আগেই দুধ খাব?

—খাও বাবা, খাও।

শাশুড়ি আবার অনুরোধ করলেন।

—দুধ আমি পরে খাব মা।

কিন্তু শাশুড়ি সেই একই কথা বললেন—না বাবা, আগে একটু দুধ খাও।

জামাই ভাবল, এটাও বোধ হয় দেশের কোন রীতি। তার ওপর শাশুড়ি অমন করে বলছেন, তাঁর কথা না রাখাটা অন্যায় বলে মনে হল। তাই সে দুধের বাটিটা তুলে চুমুক দিল। যেই না চুমুক দেওয়া, অমনি তাকে ঘিরে যে বাজনদাররা বসে ছিল তারা কাঠি চালিয়ে বাজিয়ে দিল ঢাকঢোল। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। কলকাতার জামাই তখন আনন্দে গদগদ। তাকে ঘিরে এত ঢাক-ঢোল-বাজনা, একটা উৎসবের পরিবেশ—এ তো মন্দ ব্যাপার নয়।

জামাইয়ের এবার নজর গেল পাশে বসা শাশুড়ির দিকে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তিনি কাঁদছেন। জামাই তাকাতেই এবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন—আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে বাবা। তুমি আজ আমার ছেলের কাজ করলে।

বেচারা জামাই তখনও বুঝতে পারছিল না আগে দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে সে কি এমন কাজ করল যে শাশুড়ি অমন করে কেঁদে ভাসাচ্ছেন। অবশ্য ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে দেরি হল না। শাশুড়ি তেমনি জামাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাকে আশীর্বাদ করে বলতে লাগলেন—তুমি হলে কলকাতার ছেলে গো, তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে। ঐ দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থিগুঁড়ো, অ্যাদ্দিনে তিনি তোমার জন্য গঙ্গা পেলেন!

শাশুড়ির কথা শুনে জামাইয়ের তো তখুনি বমি উগরে আসার যোগাড়।



।। পরীক্ষার পরিণাম ।।

নিজের সভাসদদের নিয়ে রাজার খুব গর্ব। সভাসদরা প্রত্যেকেই বলেন—আমি আমার প্রভুর জন্য যখন-তখন প্রাণ দিতে পারি। রাজার গর্ব সে কারণেই। তিনি ভাবেন, তিনি ভাগ্যবান। এতগুলি বিশ্বস্ত সভাসদ তাঁর রয়েছে, তাঁর আবার ভাবনা কিসের ?

রাজা প্রায়ই কথাটা বলতেন তাঁর পরিচিতদের।

একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন রাজার কাছে। কথায় কথায় রাজা তাঁকে সেই কথা বললেন—কোন রাজসভায় এতগুলি গুণী ও বিশ্বস্ত মানুষ দেখা যায় নি।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন রাজার কথা শুনে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—হাসছেন যে ?

—আপনার কথায়। সব সভাসদ আপনার বিশ্বস্ত এবং সৎ, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করেন না ?

—না।

—বেশ, আপনি তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সন্ন্যাসী রাজি হলেন। বললেন—রাজা, আমি একটা যজ্ঞ করব। এই যজ্ঞ করলে আপনার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে, এর একটা শর্ত আছে। যজ্ঞের জন্য আপনি একটা ছোট পুকুর কাটবেন, আর আপনার প্রত্যেক সভাসদকে বলবেন, অন্ধকার রাতে ঐ পুকুরে এক কলসী করে দুধ ঢালতে। এভাবে পুকুরটা হবে দুধপুকুর।

শুনে রাজা হেসে উঠলেন। বললেন—এ আবার একটা পরীক্ষা !

যাই হোক, রাজা পুকুর কাটিয়ে তাঁর সব সভাসদদের নির্দেশ দিলেন, ঐ পুকুরে অন্ধকার রাতে এক কলসী করে দুধ ঢালতে। সভাসদরা প্রত্যেকেই মাথা নেড়ে চলে গেল।

রাত গভীর হল। সভাসদরা একে একে নিজের নিজের ভর্তি কলসী খালি করে দিয়ে গেল পুকুরে।

সকাল হতেই রাজা সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ঐ পুকুরে। দেখলেন, অবাক কাণ্ড। এক ফোঁটা দুধ নেই পুকুরে, শুধু জল আর জল।

দেখে রাজার চোখ কপালে ওঠার দাখিল। সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখে মৃদু হাসি, যেন এমন ঘটনা যে ঘটবে তিনি তা জানতেন।

খুব রাগ হল রাজার। হুকুম দিলেন—ডাকো সভাসদদের।

তারা এল। প্রত্যেকেরই কাঁচুমাচু মুখ, ভয় পেয়েছে সকলেই। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, তারা প্রত্যেকেই ভেবেছে, যখন এত কলসী কলসী দুধ ঢালা হচ্ছে, তখন এক কলসী জল ঢাললে কেউ তা ধরতে পারবে না।

ফলে পুকুরে দুধ আর পড়ে নি, শুধু পড়েছে জল!

[প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া সত্যিই দায়। সময়ে তা প্রমাণ হয়।]



।। মূর্খ ভগবান ।।

একটি লোক এল ঠাকুর-দর্শনে। দর্শনের পর মনের আনন্দে বিকট আওয়াজ করে সে ঠাকুরের গীত গাইতে শুরু করল।

মন্দিরের পাশের দালানে এক কোণে বসে ঝিমুচ্ছিলেন চোবেজী। চোবেজীই হলেন ঐ মন্দিরের পুরোহিত। দুবেলা পুজো-আচ্চা করেন, কুস্তি করেন, সেতার বাজান আবার হেন অপকম্ম নেই যা করেন না। সময়-সুযোগ পেলেই নেশাভাঙ করেন। সেদিন যেমন দু লোটা ভাঙ খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

হঠাৎ ঐ লোকটির বিকট বেসুরো গান চোবেজীর ঝিমুনি কাটিয়ে দিল। নেশায় চুর ঢুলুঢুলু চোখদুটো মেলে চোবেজী আবিষ্কার করলেন, মন্দিরের সামনে বসে কে যেন ভাবে বিভোর হয়ে কাজের বাড়ির কড়া মাজার মত আওয়াজ করে রাম-ভরত-হনুমান প্রভৃতির পিণ্ডি চটকাচ্ছে।

কোন এক উজবুক তার সাধের নেশায় ব্যাঘাত ঘটাল দেখে চোবেজী খুব বিরক্ত হলেন। নেশাজড়ানো গলায় বললেন—অমন বেসুরো গলায় চিৎকার করছ কেন হে বাপু?

লোকটা চটপট জবাব দিল—আমার আবার সুর-তালের কি দরকার হে? আমি ঠাকুরের মন ভেজাচ্ছি।

কথা শুনে চোবেজী আরও বিরক্ত হলেন। চেঁচিয়ে উঠে বললেন—হুঁ, ঠাকুরের মন ভেজাচ্ছিস! ঠাকুর কি এত বড় আহম্মক রে? পাগল তুই, আমাকেই ভেজাতে পারছিস না, ঠাকুরকে ভেজাবি! ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশি মূর্খ রে?

লোকটি অবশ্য বেসুরো গলায় তার গান থামাল না। কেননা তার ধারণা, 'আমি তোমার শরণাগত' এ কথা চিৎকার করে জানালেই যথেষ্ট ভক্তি হবে।

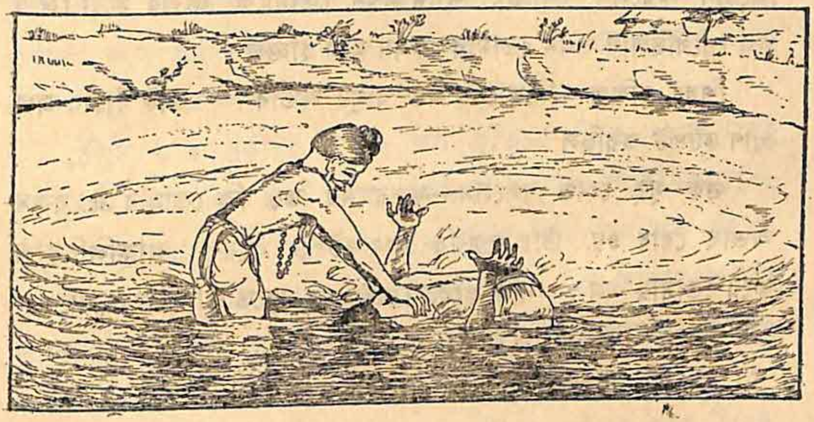
[শুধু চেঁচিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না।]



।। ভগবানকে পাওয়া ।।

যুবক শিষ্য গিয়ে ধরল গুরুকে—প্রভু, আমি ধর্ম লাভ করতে চাই, ভগবানকে পেতে চাই। আপনি উপায় বলে দিন।

গুরুর পা জড়িয়ে ধরে শিষ্য আকুলিবিকুলি করতে থাকে। গুরু কিছু বলেন না, শুধু শিষ্যের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকেন।



শিষ্য মনে দুঃখ পেল। বলল—এমন আকুল হয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা জানালাম প্রভু, আপনি আমলই দিলেন না!

গুরু তবু কিছু বললেন না।

তখন গরমকাল। খুব গরম পড়েছে। শিষ্য তখনও গুরুর সঙ্গে। গুরু বললেন—চল, নদীতে স্নান করে আসি।

দুজনে নদীতে এসে খুব করে স্নান করতে লাগল।

এক সময় শিষ্য যখন জলে ডুব দিয়েছে, গুরু চট্ করে কাছে গিয়ে তাকে জোর করে জলের ভেতরে চেপে ধরলেন।

—এ কি করছেন গুরুদেব, ছাড়ুন, ছাড়ুন!

জলের ভেতর ছটফট করতে থাকে শিষ্য।

গুরু কোন কথা বলেন না, শিষ্যকে ছাড়েনও না, তাকে তেমনি

জলের নিচে চেপে ধরে থাকেন। শুরু হয়ে যায় গুরু-শিষ্যের ধ্বস্তাধ্বস্তি।

শেষ পর্যন্ত গুরু তাকে ছাড়লেন। শিষ্য তখন ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে। তার নাকে-মুখে জল ঢুকে গেছে, সে যেন এক বিশ্রি অবস্থা। সে বুঝতেই পারল না গুরু কেন এমন করলেন। একটু বিরক্তির সুরেই বলল—ওভাবে জলের মধ্যে চেপে ধরলেন প্রভু? আর একটু হলে মরেই যেতাম!

গুরুর কানে যেন ওসব কথা গেলই না। মৃদু হাসছিলেন তখনও। জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, আমি যখন তোমাকে জলের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছিলাম তখন তোমার কেমন মনে হচ্ছিল।

শিষ্য বলিল—নিঃশ্বাসের জন্য বায়ুর অভাব। তাই বাঁচার জন্য প্রাণ ছটপট করছিল।

গুরু মৃদু হেসে বললেন—ভগবানের জন্য কি তোমার ঐ রকম অভাব বোধ হয়, তাঁর জন্য কি প্রাণ ছটপট করে? আকুলিবিকুলি করে তোমার মন? যদি করে, তবেই এক মুহূর্তে তুমি তাঁকে পাবে।

[ভগবানকে পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।]





॥ দুই পাখি ॥

একই গাছে থাকে দুটো পাখি—একটা ওপরে, একটা নিচে।

ওপরের পাখিটা ধীর স্থির, ডাকে কম, সব সময় কি যেন ভাবে। নিজেকে সে সুখীও মনে করে না, আবার দুঃখীও নয়।

নিচের পাখিটার চরিত্র ঠিক ওর উলটো। সে অস্থির, ডাকাডাকি লাফালাফি করে সব সময়। কখনও গাছের মিষ্টি ফল খায়, কখনও তেতো ফলে মুখ দেয়। কখনও গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফ দেয়, আবার কখনও চুপ করে বসে থাকে।

ঠোঁটে করে একদিন একটা ফল কুড়িয়ে নিয়ে আসে নিচের পাখিটা। ভেবেছিল মিষ্টি ফল, কিন্তু খেয়ে দেখে, ফলটা তেতো—মুখে দেওয়া যায় না। এত কষ্ট করে কুড়িয়ে আনা ফলটাকে এভাবে নষ্ট হতে দেখে তার মনটা দুঃখে ভরে যায়। সে তাকায় ওপরের পাখিটার দিকে। সে মিষ্টি বা তেতো কোন ফলই যায় না, আনন্দ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করে না।

হঠাৎ ওপরের পাখিটার প্রতি খুব হিংসে অনুভব করে নিচের পাখি। মনে হল, ও বেশ আছে, ওর মত কোন ফলই আর খাবে না সে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—একটু পরেই নিচের পাখিটা সব ভুলে আবার ঐ ফলটায় মুখ দিল। ইস্, কি তেতো! মুখটাই বিশ্রি হয়ে গেল। দুঃখে ভরে গেল নিচের পাখির মন।

আবার ওপরের পাখির দিকে তাকায় সে। তেমনি শান্তভাবে গাছের ডালে বসে আছে পাখিটা। নিচের পাখি ঠিক করল, ওপরের পাখির কাছে যাবে, তাকে নিজের দুঃখের কথা বলবে। আর চেষ্টা করবে তার মতে হতে।

ভাবতে ভাবতে সত্যিই সে একদিন ওপরের পাখিটার দিকে এগোতে লাগল। কাছাকাছি গিয়ে দেখল, ঐ পাখিটার গা থেকে কেমন একটা আশ্চর্য জ্যোতি বেরোচ্ছে, চারদিক ভরে গেছে সেই আলোয়।

ঐ জ্যোতি দেখে নিচের পাখির মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। সে পাখিটার আরও কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কি! কোথায় সেই পাখি, কোথায় তার জ্যোতি? ভোজবাজির মত সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

নিচের পাখি তখন এর অর্থ বুঝল। বুঝল, সে নিজেই হল ওপরের পাখি, জ্যোতি তারও আছে। কিন্তু সেদিকে না দেখে বার বার সে সংসারের তেতো ফলকে মিষ্টি ফল ভেবে কুড়িয়ে এনে খেতে যাচ্ছে, আর দুঃখ পাচ্ছে। সে হল ওপরের পাখিটার ছায়া, ওপরের পাখি হলেন ঈশ্বর। ওপরের পাখির মত হওয়া, তাকে ধরতে পারা সহজ ব্যাপার নয়, তাহলে ঐ পাখিটার মত তাকেও ধীর স্থির নির্বাক হয়ে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে ঈশ্বরের ভজনার মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। তাহলে আর সুখ বা দুঃখবোধ থাকবে না।

[পৃথিবীতে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান রয়েছেন।]



।। ভগবান ভক্তের ।।

ব্রাহ্মণের ছেলে গোপাল পাঠশালায় পড়ে। পড়াশুনোয় তার মনোযোগ দারুণ। শত অভাব আর কষ্টের মাঝেও গরীব বিধবা ব্রাহ্মণীর একমাত্র শান্তি, তার ছেলেটি নিজেই মন দিয়ে পড়াশুনো করে. 'পড়, পড়' বলে তাকে চিৎকার করতে হয় না।

সমস্যা দেখা দিল পড়া নিয়ে নয়, পাঠশালায় যাওয়া নিয়ে। পাঠশালাটা অনেক দূরে। সকালে বিকালে বসে। সকালে আসা-যাওয়া নিয়ে অসুবিধে হয় না, বিকেলে ছুটির পর হয় মুসকিল। বিশেষ করে শীতের দিনে। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসে বড় তাড়া-তাড়ি, পাঠশালার ছুটি হতে হতেই সন্ধ্যের অন্ধকার—বাড়ি আসতে আসতে তো বেশ রাত। আরও সমস্যা—পাঠশালায় যাবার পথ একটাই এবং সেই আঁকাবাঁকা পথটি গেছে এক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পাঠশালা ছুটির পর জনমানবহীন এই জঙ্গলের পথ দিয়ে একা একা বাড়ি ফিরতে গোপালের বড্ড ভয় করত।

একদিন শীতের বিকেলে পাঠশালায় যাবার জন্য তৈরি হতে হতে গোপাল ঐ কথা তার মাকে বলেই ফেলল।

—মা, আমার ভীষণ ভয় করে।

—কিসের ভয় বাবা? মা সস্নেহে প্রশ্ন করেন।

—বাড়ি আসতে আসতে ঘোর সন্ধ্যে হয়ে যায়, ভারি ভয় করে। কত বড় জঙ্গল, সাপের ভয়, ভূতের ভয়।

মা বোঝেন, ছেলে ঠিক কথাই বলেছে। ওইটুকু ছেলে, অমন গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে তাকে আসতে হয়, ভয় তার করতেই পারে।

ছেলে বলে—মা, অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে লোক যায়, আবার ফেরার সময়েও তাদের সঙ্গে কোন লোক থাকে। আমায় কেন কেউ সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসে না মা?

ছেলের কথায় দুঃখ পান ব্রাহ্মণী। গরীব বিধবা তিনি। একখণ্ড জমি ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারে নি তার স্বামী। মারা গেছেন হঠাৎ। তাতে ব্রাহ্মণীর দুঃখ আরও বেড়েছে। ঐ সামান্য জমিতে যেটুকু চাষ হয় তাই নিয়ে, আর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ফল-মূল ইত্যাদি চেয়ে-চিন্তে কোন রকমে দিন চলে তাঁর। সময় পেলে সুতো কাটেন, তাতেও সামান্য কিছু আয় হয়। দিন চলতে চায় না, তবু ভরসা ঐ গোপালকে। তার গোপাল একদিন লেখাপড়া শিখে বড় হবে, অনেক টাকাপয়সা আয় করে তার দুঃখ ঘোচাবে—এই ভরসাতেই আছেন তিনি।

ব্রাহ্মণীর ঘরে ছিল বালগোপালের এক ধাতুমূর্তি। স্বামী মারা যাবার পর ঐ মূর্তি হয়েছে তার অতি আপন। মূর্তির সেবাতেই তিনি বিভোর হয়ে থাকেন সব সময়, ঐ মূর্তিকেই নিজের ছেলের মত আদর করেন, খাওয়ান, ঘুম পাড়ান। অগাধ বিশ্বাস তার এই মূর্তির ওপর। মনে-প্রাণে তিনি বিশ্বাস করেন, এই ঠাকুরই তাকে এত বিপর্যয়ের মধ্যে রক্ষা করছেন, ভবিষ্যতেও তিনিই তাকে সব আপদ-বিপদ থেকে বাঁচাবেন।

ছেলের শেষ কথাটা ব্রাহ্মণীর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সত্যিই গোপালকে পাঠশালা থেকে নিয়ে আসার লোক রাখার ক্ষমতা তার নেই, তিনি বড় গরীব। কিন্তু ছেলেকে মুখ ফুটে এ কথা তিনি বলেন কি করে? এটুকু ছেলে, মায়ের সামর্থ্য-অসমার্থ্যের কথাটা বুঝবে কি ভাবে?

চোখের জল ফেলতে ফেলতে ব্রাহ্মণী বালগোপালের কাছে প্রার্থনা জানান, তুমি আমার ছেলের ভয় দূর করে দিও, বিপদে তাকে রক্ষা করো প্রভু।

তার পরেই তার কি মনে হয়, ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন—ভয় নেই বাবা তোর। ঐ বনে আমার একটা ছেলে থাকে, তার নাম মধুসূদন। তোর বড় ভাই। অন্ধকার পথে খুব ভয় পেলে তাকে ডাকিস।

. বিশ্বাসী মায়ের ছেলে গোপাল। অন্তর দিয়ে সে বিশ্বাস করল, তার এক ভাই আছে বনের মধ্যে।

পরদিন পাঠশালা থেকে ফেরার পথে খুব ভয় লাগল গোপালের। মায়ের কথা মনে পড়ল তার। অমনি সে ডাক দিল—মধুসূদন দাদা, ও মধুসূদন দাদা। তুমি কি এই বনে থাকো ? আমার বড় ভয় করছে। মন প্রাণ দিয়ে গোপাল তাকে ডাকতে লাগল।



দূর থেকে অমনি এক কিশোরকণ্ঠ ভেসে এল—ভয় নেই ভাই আমি এই বনে রয়েছি। তুমি আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যাও।

জঙ্গলের মধ্যে আর একজন লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে গোপালের মনের ভয় ভাব আস্তে আস্তে দূর হয়ে গেল। সে আগের মত মনের সাহস ফিরে পেল তারপর নির্ভয়ে হেঁটে বাড়ী চলে গেল। এমনি করে গোপাল দিনের পর দিন বনের মধ্যে ভয় পেলেই তার দাদাকে ডাকে, আর একই স্বর শুনতে পায়। তার সাহস বাড়ে, নির্ভয়ে সে বাড়ি চলে আসে।

মাকে একদিন গোপাল সব কথা বলে।

মা তো ছেলের মুখে সব শুনে অবাক। বিস্ময়ে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি। মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ তার কথাই বেরোল না। শেষে বললেন—বাবা, এরপর যখন মধুসূদন দাদার সঙ্গে তোর কথা হবে, তখন তাকে বোলিস যে যেন তোকে দেখা দেয়।

পরদিন বনপথে ভয় পেতে গোপাল তার দাদাকে ডাকল।

অমনি অন্যান্য দিনের মত উত্তর এল—ভয় নেই গোপাল, এগিয়ে যাও, আমি আছি।

কিন্তু আজ আর গোপাল কথায় সন্তুষ্ট হল না। বলল—মধুসূদন দাদা, আমি তোমায় কোনদিন দেখিনি। আজ তুমি আমায় দেখা দাও।

যেই এই কথা বলা, অমনি গোপাল দেখল। তার সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোর বালক। পরণে তার রাখালের বেশ, মাথায় ছোট মুকুট, তাতে বসানো শিখিপুচ্ছ, হাতে বাঁশের বাঁশি। অপরূপ সুন্দর সেই কিশোরকে দেখে গোপাল তো মহা খুশি। একসঙ্গে মিলে খেলা করল, গাছে উঠল, ফল পাড়ল, ফুল কুড়োল, তারপর গোপাল তার বাড়ি ফিরে এল।

বাড়ি এসে গোপাল সব কথা বলল তার মাকে। মা শোনেন সব, বোঝেন সব কিছুই। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তার দু চোখ জলে ভরে ওঠে। তার ঠাকুর সত্যিই পরম করুণাময়, নইলে এভাবে তার ছেলের খেলার সঙ্গী হন!

এভাবেই কেটে যেতে লাগল দিনের পর দিন।

এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। যে পাঠশালায় গোপাল পড়ত, সেখানের গুরুমশাইয়ের বাড়িতে একজন মারা যাওয়ায় তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন এল। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে গোপালও ঐ অনুষ্ঠানের যাবার নিমন্ত্রণ পেল। অন্যান্য ছেলেরা তো শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে আসতে বলাবলি শুরু করে দিল, কে কি দেবে। কেউ বললে টাকা দেব, কেউ জিনিসপত্র, ফাঁপরে পড়ল শুধু গোপাল—তারা যে বড় গরীব; নিজেদেরই খাওয়া জোটে না ভাল করে, তো অন্যকে দেওয়া!

মাকে এসে সব কথা জানাল গোপাল।

মা তো ভেবে কিনারা করতে পারেন না কি করবেন। শেষে ঠিক করলেন, চিরদিন সব অবস্থাতেই যা করে এসেছেন, আজও তাই করবেন। তিনি গোপালবেশী শ্রীকৃষ্ণের ওপরেই নির্ভর করবেন।

ছেলেকে বললেন—তুই তোর দাদার কাছ থেকেই কিছু চেয়ে নিস বাবা গুরুমশাইয়ের জন্য।

পরদিন বনের পথে গোপালের সঙ্গে তার দাদার দেখা হল। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ খেলা করল, তারপর বিদায় নেবার একটু আগে গোপাল তার দাদাকে নিজের দুঃখের কথা জানাল। আজ গুরুমশাইয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান, সে কি করবে ?

গোপালের কথা শুনে তার দাদা মিটিমিটি হেসে বলল—দেখ গোপাল, আমি বনের সামান্য রাখাল, মাঠে মাঠে গরু চরাই। আমার তো টাকাপয়সা কিছুই নেই।

গোপাল খুব দুঃখের সঙ্গে বলল—তাইত, এখন কি হবে ?

গোপালের দাদা বলল—চিন্তার কিছু নেই ভাই। যে কোন একটা উপহার দিলেই তো চলবে। তুমি এই ক্ষীরের ছোট্ট বাটিটা নিয়ে যাও এটাই তোমার গুরুমশাইকে দিও।

গোপালের মনে আর আনন্দ ধরে না। সে ঐ ছোট্ট বাটিটা নিয়ে পাঠশালায় ছুটল। কিন্তু সেখানে তার সহপাঠীরা তার হাতে ঐ ক্ষীরের বাটিটা দেখে খুব ঠাট্টা করতে লাগল। ঠাট্টা শুনে গোপালের চোখে জল এসে গেল, মন খুব দমে গেল। আর তো কিছু করারও নেই। একরকম নিরুপায় হয়েই গোপাল ঐ ক্ষীরের পাত্র তুলে দিল তার গুরুমশাইয়ের হাতে। গুরুমশাই ঐটুকু সামান্য ক্ষীর দেখে বিরক্ত হলেন গোপালের উপর। খুব চটে গেলেন মনে মনে কাজের বাড়ী তাই চুপ করে রইলেন আপাততঃ। ক্ষীরটুকু নিয়ে একটা বড় পাত্রে ঢেলে দিলেন। কিন্তু এ কি ! তিনি তাকিয়ে দেখলেন ক্ষীর ঢালার পর সেই ছোট পাত্রের ক্ষীর আগের মতই পরিপূর্ণ রয়েছে। হয়ত চোখের ভুল তাই তিনি আবার ছোট পাত্রের ক্ষীর ঐ বড় পাত্রটিতে ঢেলে রাখলেন আশ্চর্য্য সেই একই ব্যাপার। শূন্য পাত্র মুহূর্তে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যতবারই পাত্র থেকে ক্ষীর ঢালা হচ্ছে ঠিক ততবারই পাত্রটি আগের মত পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। উপস্থিত সকলে একদম হতবাক। একি ব্যাপার এ কি করে সম্ভব ! এমন ব্যাপার স্যাপার কেউ কখনও দেখেনি। সবাই যেন কেমন বোবা হয়ে গেল। ঘোর

কাটতে প্রথম কথা বলল গুরুমশাই ;প্রশ্ন করলেন গোপালকে। তুই এই ক্ষীরের বাটী কোথা থেকে পেলি, কে দিয়েছে তোকে।

গোপাল বললে, আমার দাদা দিয়েছে।

কে তোর দাদা, কি তার নাম, কোথায় থাকেন তিনি, গুরুর গলায় অবিশ্বাসের সুর।

গেপোল তখন সব ঘটনা খুলে বলল, কেমন করে দাদার সাথে দেখা হ'ল কেমন করে ভাব হ'ল এমন কি গুরুমশাই-এর বাড়ীতে উপহার দেবার জন্য কিছুই নেই শুনে তার দাদা তাকে তখন এই ক্ষীরের পাত্রটি দিয়েছিল সব কথাই বলল সে।

শুনে গুরুমশাই বললেন মিথ্যে কথা কখনই সম্ভব নয়। তুই বলছিস্ তোর দাদা আছে একজন সে বনের মধ্যে থাকে, পারবি আমাকে দেখাতে তবেই বুঝব তুই যা বলেছিস সব সব সত্যি।

গোপাল তো এক পায়ে খাড়া। তখুনি গুরুকে নিয়ে এল বনে।

বিকেলে যে জায়গায় ওরা খেলেছিল, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে গোপাল ডাকতে থাকে—দাদা! দাদা গো! কোথায় তুমি? আজ আমার সঙ্গে গুরুমশাই এসেছেন, তোমায় দেখবেন।



কিন্তু, কোথায় কে? আজ আর কেউ এল না সামনে।

গোপাল করুণ সুরে তখন ডাকতে থাকে—দাদা গো, কোথায় তুমি? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না কেন? তুমি সাড়া না দিলে গুরু যে আমায় মিথ্যাবাদী ভাববেন!

ডাকতে ডাকতে সত্যিই ঘেমে নেয়ে উঠেছিল গোপাল।

তখন অনেক দূর থেকে একটা স্বর ভেসে আসে। গোপাল শুনেই বুঝতে পারল, এ তার দাদার গলা। সেই কণ্ঠস্বর বলছে— ভাইরে, তোমার আর তোমার মায়ের আমার উপর রয়েছে ভক্তি আর বিশ্বাস, তাই তোমরা ডাকলেই আমি তোমাদের কাছে যাই। কিন্তু তুমি যাকে নিয়ে এসেছ; তার ভক্তিও নেই, বিশ্বাসও নেই, তার কাছে আমি তাই যেতে পারি না গোপাল! তুমি কিছু মনে কোরো না, তোমার গুরুকে বোলো সে কথা!

[প্রকৃত ভক্ত না হলে, বিশ্বাস আর ভক্তি না থাকলে ঈশ্বর তাঁকে দেখা দেন না।]



।। সব বলা যায় না ।।

চারজনে খুব বন্ধুত্ব। সব সময় তারা একসঙ্গে থাকে।

একদিন তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছে একটা নতুন জায়গায়। দেখল, একটা জায়গার চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

এক বন্ধু বলল, 'চল না, দেখা যাক, ওখানে কি আছে।'

আর একজন বলল, 'পাঁচিলে না উঠলে দেখা যাবে না। আর, সকলেরই বা কষ্ট করে ওঠার কি দরকার। একজন দেখে এসে বলে দিলেই তো হয়, আমরা সবাই জেনে যাব।'

তখন এক বন্ধু পাঁচিলের মাথায় উঠে ও পাশে দেখতে লাগল।

তাই দেখে নিচ থেকে তিন বন্ধু বলে উঠল, 'কি দেখছ ?' আমাদের বল।

প্রথম বন্ধু বলল, 'আহা-হা' কি সুন্দর !'

বলেই সে পাঁচিলের ওদিকে লাফিয়ে পড়ল, আর উঠল না।

তখন দ্বিতীয় বন্ধু বলল, 'তাহলে আমি গিয়ে দেখি।'

তারপর পাঁচিলে উঠে সে ওপাশে উঁকি দিতে লাগল। আর দুই বন্ধু নিচ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে ওদিকে ? তুমি একবার বল।'

দ্বিতীয় বন্ধু বলে উঠল, 'আহা-হা কি সুন্দর !'

বলেই ও পাশে লাফিয়ে পড়ল, আর উঠল না।

এবার তৃতীয় বন্ধু বলল, 'ওরা তো এল না। আমি উঠে দেখি।'

সে-ও পাঁচিলে উঠলে, নিচের বন্ধুটি বলল, 'কি দেখছ বল।'

তৃতীয় বন্ধুর মুখেও ঐ একই কথা, 'আহা-হা, কি সুন্দর !'

বলেই সেও ওপাশে লাফিয়ে পড়ল, আর ফিরে এল না।

তখন চতুর্থ বন্ধুও পাঁচিলে উঠল দেখবার জন্য। তারপর সে-ও 'আহা-হা, কি সুন্দর' বলে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল। আর উঠল না।

[ঈশ্বর কেমন, তা কেউ বলে বোঝাতে পারে না। নিজের অনুভূতি দিয়ে তাকে বুঝতে হয়।]



।। অন্ধের হাতি দেখা ।।

জনকয়েক অন্ধ এক জায়গায় বসে ছিল। এমন সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়াল এক হাতি।

কিন্তু অন্ধেরা তো চোখে দেখতে পায় না। হাতি কেমন, তাও তারা জানে না। তাই তাদের বোঝাবার জন্য একজন লোক বলল, 'এখানে একটা বিরাট জন্তু এসেছে, তার নাম হাতি। তোমরা এর গায়ে হাত দিয়ে দেখ, তারপর বল, হাতি কি রকম।'

অন্ধেরা তখন হাতির গায়ের নানা জায়গায় হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল হাতি কি রকম জন্তু।

একজনের হাত ঠেকল হাতির পায়ে। সে বলল, 'হাতি হচ্ছে থামের মতন।'

এক অন্ধের হাত পড়েছিল হাতির কানে। সে বলল, 'হাতি হল কুলোর মতন।'

আর একজন হাত দিয়েছিল হাতির দাঁতে। সে বলল, 'হাতি হল বাঁকানো লাঠির মতন।'

এক অন্ধের হাত পড়েছিল হাতির পেটে। সে বলল, 'হাতি একটা প্রকাণ্ড জালার মতন।'

হাতির শুঁড়ে একজন হাত দিয়েছিল। সে বলল, 'হাতি হল কলাগাছের মতন।'

সবাই এক একটা কথা বলল, কিন্তু পুরো হাতিটা সম্বন্ধে কারুরই কোন ধারণা হল না।

[কোন জিনিসের অংশকে বুঝলে তার সবটাকে বোঝা হয় না, পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য সম্পূর্ণকে জানা দরকার]



।। 'আমি'-তে সর্বনাশ ।।

গোরু কেবল ডাকে 'হাম্বা', 'হাম্বা'। তার মানে, 'আমি' আর 'আমি'। দিন রাত কেবল নিজেকে নিয়ে চিন্তা। শুধু আমি। 'হাম বড়' আর 'হাম বড়'—আমিই বড়, আমিই সব, আর কেউ নেই।

এই আমির জন্য গরু কি কষ্টই না পায়। প্রথমে সে পড়ে গয়লার হাতে। গয়লা তার সব দুধ দুয়ে নেয়, তার বাচ্চাটাকেও খেতে দেয় না।

তারপর চাষীর ক্ষেতে গলায় জোয়াল বেঁধে লাঙ্গল টানে। কখনও মাথার ওপরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, কখনও বৃষ্টির অবিরাম ধারা। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—সব সময়েই গরুকে খাটতে হয় মাঠে মাঠে।

খাটবার ক্ষমতা যখন আর থাকে না, তখন কসাই তাকে কেটে ফেলে। শেষ হয় তার 'হাম্বা' 'হাম্বা' রব।

গরুর নিস্তার নেই তখনও। চামার কিনে নেয় তার চামড়া। সেই চামড়া দিয়ে সে তৈরি করে জুতো। গরুর তখন দিন কাটে লোকের পায়ের তলায়, রাস্তার ধুলো-কাদায়।

কিংবা তার চামড়ায় তৈরি হয় ঢাকঢোল। বাজিয়েরা কি জোরেই না ঢোলে চাপড় মারে। ঢাকীরা ঢাক পেটে কাঠি দিয়ে।

তবু কি রেহাই আছে গরুর ? তার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত পার পায় না। তাঁত তৈরি হয় সেই নাড়িভুঁড়ি থেকে। সেই তাতেই তো ধুনুচি হয়।

তারপর তাই দিয়ে তুলো ধোনে ধুনুরী। তখন তাতে শুধু আওয়াজ বেরোয় 'তুঁহুঁ', 'তুঁহুঁ'। তার মানে 'তুমি' 'তুমি'। আর 'আমি' 'আমি' নয়, কেবল 'তুমি'।

এতদিন পরে শান্তি পায় গরু।

[নিজেকে নিয়ে ভেবে লাভ নেই, তাতে অশান্তি বাড়ে। নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে যখন পরের কথা ভাবা যায়, তখনই আসে প্রকৃত শান্তি।]



॥ শুধু কোপ্‌নির জন্যে ॥

গ্রামের বাইরে ছোট্ট এক কুঁড়ে ঘরে থাকেন এক সাধু। সাধন-ভজন আর ফলমূল আহার করে দিব্যি দিন কাটে তাঁর।

কিছুই সম্পত্তি নেই সাধুর। সম্বল বলতে পরার দুটি কোপ্‌নি (কৌপীন)। কোন দুঃখ নেই সাধুর, দিব্যি ছিলেন আপন মনে একা।

হঠাৎ মুসকিল বাধল কোপ্‌নিদুটো নিয়ে। ইদুঁর যে কখন এসে কোপ্‌নি কেটে দেয়, সাধু ধরতে পারেন না কিছুতেই।

ভিক্ষেয় বেরোলে ছেঁড়া কোপ্‌নির দিকে নজর পড়ে লোকের। তারা জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে সাধুবাবা? আপনার কোপ্‌নি ছেঁড়া কেন?'

সাধু বলেন, 'ইদুঁরের বড় উৎপাত হয়েছে।'

লোকে পরামর্শ দেয়, 'ঘরে বেড়াল রাখুন। তাহলে ইদুঁর জব্দ হবে।'

তখন সাধু বেড়াল পুষলেন। সত্যিই ইদুঁর আসা বন্ধ হল। সাধুবাবার কোপ্‌নিও ঠিক থাকে।

কিন্তু বেড়ালটা 'মঁ্যাও' 'ম্যাও' শব্দ করে বড় জ্বালাতন শুরু করল। সাধুর সাধন-ভজনে তাতে বিঘ্ন হয়। তার ওপর এক জ্বালা—বেড়ালের দুধ চাই যে, নইলে সে খাবে কি?

সাধু তখন গৃহস্থের বাড়ি দুধ চাইতে বেরোলেন। দু-একদিন সাধুকে দুধ দিল সবাই, তারপর তাদের মুখ ব্যাজার হল। তারা সাফ কথা বলল, 'রোজ রোজ দুধ দিতে পারব না সাধুবাবা। একটা গরু রাখুন না, তাহলে অনেক দুধ পাবেন।'

ঠিক কথা। সাধু তখন একটা গরু কিনে আনলেন।

বেড়ালকে দুধ খাওয়ানোর সমস্যা মিটল, কারণ গরুটা দুধ দিচ্ছিল বেশ। কিন্তু তাকেও তো খাওয়াতে হবে। শুধু মাঠের ঘাস খেয়ে তার হয় না, গরুর পেট ভরাতে হলে চাই খড়।

সাধু আবার খড় চাইতে গেলেন লোকের বাড়ি বাড়ি। কিন্তু কে

রা—৪

কদিন বিনে পয়সায় খড় দেবে। দু-চারদিন দিয়ে আর কেউ দেয় না। উলটে তারা পরামর্শ দিল, 'নিজে জমি চাষ করুন না। ধানও পাবেন, খড়ও মিলবে।'

সাধুর মনে ধরে কথাটা। তাঁর কুঁড়ের সামনে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল। সেখানে তিনি চাষ শুরু করে দিলেন।

চাষের শেষে অনেক ধান পাওয়া গেল। খড়ও মিলল অনেক। গরুকে খাওয়ানোর সমস্যা মিটল।

এবার সাধুর আর এক ভাবনা—এত ধান, এত খড় রাখবেন কোথায়?

সমস্যা সমাধানের জন্য সাধু তখন অন্য চাষীদের মতন গোলাঘর তৈরি করলেন।

এমন সময় একদিন সাধুবাবার গুরু এলেন। অনেকদিন শিষ্যের সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই খবর নিতে এসেছেন শিষ্যের সাধন-ভজন কেমন চলছে।

সাধু তখন মাঠে কাজ করছিলেন। গুরুকে দেখেই ছুটে এলেন।



গুরু তাঁর চাষ করা দেখলেন। দেখলেন তাঁর গাই গরু, ধানের গোলা, স্তূপাকার খড়। আশ্চর্য হয়ে শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কি ব্যাপার?'

সাধু লজ্জায় মাথা হেঁট করে বললেন, 'গুরুদেব, সবই কোপ্‌নির জন্যে!'

[ছোট্ট প্রয়োজন জীবনে অনেক বড় অনর্থ ডেকে আনে।]



॥ বুদ্ধির নিশানা ॥

গ্রামের পথ দিয়ে চলেছিল দুটি লোক।

গ্রীষ্মের দুপুর, সহজেই তাই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সামনেই দেখল একটি বড় আমবাগান। দুজনে তাই বাগানে ঢুকে একটা বড় গাছের নিচে বিশ্রাম করতে লাগল।

বাগানটিতে আমগাছ ছিল অনেক। তখন তো গরম কাল, আমের সময়। দুজনেই দেখল, গাছে গাছে কত আম ফলে রয়েছে।

একজন অত আম দেখে কাগজ পেনসিল নিয়ে হিসেব করতে বসল। বাগানে কতগুলো আম গাছ, তাদের কত ডাল হতে পারে। প্রতিটি ডালে আন্দাজ কটি করে আম আছে। তাহলে গোটা বাগানে মোট আমের সংখ্যা কত।

তারপর সে ভাবতে লাগল, সব আম নিয়ে যেতে কখানা গাড়ি লাগবে। এককে গাড়ি আমের কত দাম পাওয়া যাবে। গাড়ি ভাড়া আর মজুরিই বা কত লাগবে। তাহলে এত গাড়ি আমে কত টাকা লাভ হবে।

এমনি করে বাগান থেকে প্রথম লোকটি লাভের হিসেব কষছিল। দ্বিতীয় লোকটি কিন্তু অত সব হিসেবপত্তরের ধারেকাছেও গেল না। সে তখন এ গাছ ও গাছ ঘুরে ঘুরে দেখছিল, আর পাকা আম দেখলেই পেড়ে খেয়ে নিচ্ছিল।

[এটা করব, ওটা করব বলে কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়ালে লাভ কিছুই নেই। যা করার তা কাজে করতে হয়, তাহলেই লাভ পাওয়া যায়।]



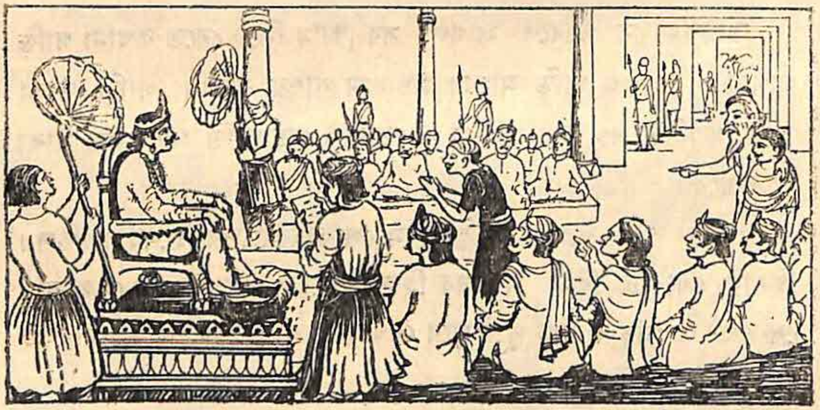
কে রাজা ?

গুরুর এক শিষ্য ছিল। খুব মনোযোগী আর বাধ্যের। গুরুর সেবাও করে মন প্রাণ দিয়ে, গুরু তাই তাকে খুব ভালবাসেন। দেশের রাজাও খুব মান্য করেন গুরুকে। নানা বিষয়ে পরামর্শ করে থাকেন গুরুর সাথে। গুরু নিজে প্রায়ই রাজদরবারে যান।

শিষ্যের তাই সাধ হল রাজাকে দেখার। বলল, 'গুরুদেব, আমার বড় ইচ্ছে, রাজাকে নিজের চোখে দেখি।'

শিষ্যের ইচ্ছে দেখে গুরু তাকে নিয়ে এলেন রাজবাড়ির সামনে।

প্রকাণ্ড সাত মহলা প্রসাদ। দেখে তো শিষ্য অবাক হল। এত বড় বাড়ি এর আগে সে জীবনে দেখেনি। তার উপর কত লোকজন,



হৈ হট্টগোল। যেদিকে তাকায়, সেদিকেই অবাক হওয়ার মত সব কাণ্ডকারখানা।

গুরু তাকে নিয়ে আসেন প্রথম দেউড়িতে। শিষ্য দেখল দামী ঝলমলে পোষাক পরে সেখানে বসে আছে একটি লোক। কি সুন্দর তার স্বাস্থ্য, কিন্তু খুব গম্ভীর।

শিষ্য জিজ্ঞেস করল, 'গুরুদেব, ইনিই কি রাজা ?'

গুরু মাথা নাড়েন, 'না বৎস, ইনি নন।'

বলে গুরু এগিয়ে গেলেন দ্বিতীয় দেউড়িতে। সেখানেও শিষ্য দেখল, একটি লোক বসে আছে। তার গায়ে কত মণি মুক্তোর গয়না। এ লোকটিকেও বেশ দেখতে।

শিষ্য জিজ্ঞেস করল, 'গুরুদেব, ইনিই কি রাজা?'

গুরু বললেন, 'না বৎস।'

বলেই গুরু এগোলেন তৃতীয় দেউড়ির দিকে। সেখানে বসে আছে আর একটি লোক। তারও গায়ে কত গয়না, মণিমুক্তো, কি চমৎকার চেহারা, সব কিছু মিলিয়ে দারুণ লাগছে লোকটিকে। ঝলমল করছে সব।

শিষ্য বললে, 'ইনিই নিশ্চয়ই রাজা।'

গুরু আবার মাথা নাড়েন, 'না ইনিও নন।'

তারপর তাঁরা একে একে আরও তিনটি দেউড়িতে এলেন। প্রতিটিতেই এক একজন করে লোককে দেখা গেল। ঝলমলে পোশাক, দামী মণিমুক্তো তাদের গায়ে, চারপাশে কত না সম্পদ। কি সুন্দর তাদের চেহারা।

শিষ্য প্রতিবারই তাদের দেখছে আর গুরুকে জিজ্ঞেস করছে, 'গুরুদেব, ইনিই কি রাজা?'

গুরুদেব একই জবাব দিলেন প্রতিবার, 'না, ইনি নন।' শিষ্য তো অবাক হয়ে গেল। ভাবল এত সাজগোজ, এত ঝলমলে পোষাক, এমন সুন্দর চেহারা এসব লোকের, অথচ এরা নাকি কেউই রাজা নন। তবে আসল রাজা কেমন না জানি হবে।

শেষে তাঁরা এলেন সপ্তম দেউড়িতে। এবার শিষ্য যাঁকে বসে থাকতে দেখল, তাঁকে দেখে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা ফুটল না। কি প্রশান্ত মুখমণ্ডল লোকটির, কি অভিজাত্য, কি আচার-আচরণ! শিষ্যের মন এবার আপনা থেকেই আনন্দে ভরে উঠল। গুরুকে এবার আর প্রশ্নও করতে হল না, ইনিই রাজা কিনা।

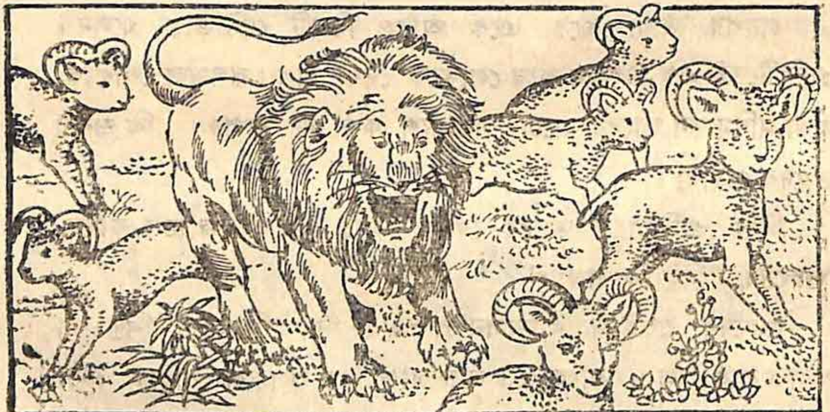


॥ নিজেকে চেনা ॥

বনের মধ্যে একটুখানি খোলা জায়গা, সেখানে এক পাল ভেড়া চড়ছিল মনের সুখে। হঠাৎ সেই পালে পড়ল এক সিংহী।

সে দু-একটা ভেড়া ধরতে না ধরতেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। কাছেই লুকিয়ে ছিল তীর-ধনুক হাতে এক শিকারী। সে ওৎ পেতে ছিল যেন সিংহীরই জন্যে। তাকে দেখা মাত্রই সে ছুঁড়ল তীর।

কি হাতের টিপ তার! তীর এসে তখুনি বিঁধল সিংহীকে।



সিংহী তো ছটফট করে উঠে এক লাফ মারল। মরণ লাফ। পড়েই মারা গেল।

সিংহীর পেটে ছিল এক বাচ্চা। ভাগ্য ভাল তার। সিংহী মারা যাবার আগেই জন্মাল সে।

শিকারী তো সিংহীকে মেরেই চলে গেল। এদিকে ভেড়ার পালে রইল সিংহীর বাচ্চা। ভেড়ার ছানাদের সঙ্গেই সে বড় হতে লাগল। ওদের মতই ঘাসপাতা খেতে লাগল, আর ডাকতে লাগল 'ব্যা' 'ব্যা' করে।

দিন যায়। ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে সিংহীর বাচ্চা। শরীর

তার সিংহের মতই বড়-সড়, কিন্তু ধরণ-ধারণ ভেড়ার মতন। নিজেকে সে তো সিংহ বলে জানে না। তাই ভেড়ার পালে চড়ে বেড়ায় বনে বনে, ঘাস খায় আর 'ব্যা' 'ব্যা' করে ডাকে।

হঠাৎ একদিন সেই ভেড়ার পালে আবার সিংহ পড়ল। ভেড়ারা তো সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যা' 'ব্যা' করে ডাকতে ডাকতে পড়ি-মরি করে প্রাণভয়ে লাগাল ছুট।

শিকার করতে আসা সিংহ অবাক হয়ে দেখে, আরে, দিব্যি একটা বড় সড় সিংহ যে রয়েছে ওদের সঙ্গে! 'ব্যা' 'ব্যা' শব্দ করে লেজ তুলে পালাচ্ছে।

ভেড়াদের বাদ দিয়ে সিংহটা তারই ঘাড় কামড়ে ধরল।

সিংহের ছানা তো ভয়ে 'ব্যা' 'ব্যা' করতে থাকে। কিন্তু সিংহ তাকে ছাড়ে না। টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে আসে। জলের ওপর টেনে এনে বলে, 'এবার তোর নিজের মুখখানা দেখ। আমারই মতন তোরও হাঁড়ি-মুখ। আমারই মতন তোর গায়ের রঙ, ঘাড়ের ওপর কেশর। তুই ভেড়া নোস, আমারই মতন সিংহ।'

এই বলে সে খানিকটা কাঁচা মাংস ওর মুখে গুঁজে দিল। সিংহের ছানা তো প্রথমে তা কিছুতেই খাবে না। কিন্তু একটু পরেই রক্ত আর মাংসের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল মনের সুখে। বাঃ, চমৎকার লাগছে তো!

এবার সিংহ বলল, 'তুই ভেড়াদের সঙ্গে থেকে তাদের মত ঘাস চিবুতিস, আর 'ব্যা' 'ব্যা' করতিস। কি লজ্জার কথা। এখন বুঝছিস তো তুই কে। আমার সঙ্গে চলে আয়।'

ভেড়াদের পালে আর সে থাকে? হালুম করে লাফ দিয়ে চলল নতুন সিংহের সঙ্গে।

[উপযুক্ত জায়গায় না মিশলে নিজস্বতা লোপ পায়।]



।। দাম আধ পয়সা ।।

দু ভাই একসঙ্গে হলে কি হবে, তাদের দুজনের স্বভাব দু রকমের। বড় ভাইয়ের সংসারে মন নেই, সাধন-ভজনের দিকে ঝোঁক তার। আর ছোট ভাই ওসবের ধারে-কাছ দিয়েও যায় না।

বড় ভাই একদিন বলল, 'আমি সংসার ছেড়ে চললুম। বনে তপস্যা করব।'

ছোট ভাই আর কি বলবে।

বড় ভাই সেই যে বিবাগী হল, আর তার কোন সন্ধান নেই। কোথায় কোন্ বনে যে দিন কাটাতে লাগল, কে জানে।

বছরের পর বছর কেটে গেল।

এদিকে ছোট ভাইয়ের লেখাপড়া শেষ হল। সে কাজকর্ম করতে লাগল। তারপর একদিন বিয়ে করে সংসারী হল।

দেখতে দেখতে আরো কটা বছর কেটে গেল।

সন্ন্যাসীদের একটা নিয়ম আছে। বারো বছর পেরিয়ে গেলে কেউ ইচ্ছে করলে একবার বাড়ি আসতে পারে। সেই নিয়ম মেনে সন্ন্যাসী বড় ভাই একদিন বাড়ি এল।

বারো বছর পরে তাকে দেখে ছোট ভাইয়ের খুব আনন্দ হল। সে খুব আদর-যত্ন করল দাদাকে, তাকে ভালো ভালো জিনিস খাওয়াল।

তারপর কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, 'দাদা', এতদিন তো সন্ন্যাসী হয়ে খুব তপস্যা করেছ। এখন আমায় বলত, তপস্যা করে তুমি কি পেয়েছ? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

বড় ভাই বলল, 'দেখতে চাস, আমি কি পেয়েছি? তাহলে আমার সঙ্গে আয়, আমি দেখাচ্ছি।'

এই বলে সে ছোট ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এল এক নদীর ধারে।

তারপর ছোট ভাইকে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে মন্ত্র পড়তে পড়তে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে এপার থেকে ওপারে চলে গেল। আবার মন্ত্র পড়ে ওপার থেকে এল এপারে।

এসে ছোট ভাইকে বলল, 'এবার দেখলি তো, কি পেয়েছি আমি।'

ছোট ভাই কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হল না। বরং একটু হেসে বলল, 'দেখলুম দাদা তোমার কেরামতি। আমি ঐ নদী পার হই খেয়ার মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে। আর তুমি এই ক্ষমতাটুকু লাভ করার জন্য বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছ! এর দাম তো আধ পয়সা!'

[সংসারী লোকের কাছে অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারের কোন দাম নেই। তারা সব কিছুকেই টাকা-পয়সা দিয়ে বিচার করে।]



।। ভোজবাজি ।।

এক বনে এক সাধু থাকতেন। কালী মায়ের সাধনা করতেন তিনি। তাতে তিনি নানা রকম আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করেন। বেশ অহঙ্কারও ছিল তাঁর।

একদিন তাঁর কাছে এক সন্ন্যাসী এলেন। সাধুর সঙ্গে অনেক গল্প করলেন তিনি। তারপর সাধুকে বললেন, 'শুনেছি আপনার খুব ক্ষমতা। তাই দেখতে এসেছি।'

শুনে সাধু তো খুব খুশি। তাঁর মনের মধ্যে অহঙ্কারী ভাবটা জেগে উঠল।

তখন সামনের পথ দিয়ে একটা হাতি যাচ্ছিল। তাকে দেখিয়ে



সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সাধুবাবা, আপনি এই হাতিটাকে মেরে ফেলতে পারেন?'

সাধু বললেন, 'নিশ্চয়ই পারি।'

বলে পথ থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে নিলেন। তারপর মন্ত্র পড়ে সেই ধুলো ছুঁড়ে দিলেন হাতির গায়ে। হাতিটা অমনি ঝটপট করতে করতে মরে গেল।

সন্ন্যাসী তাকে বাহবা দিয়ে বললেন, 'বাঃ, আপনার কি শক্তি।'

সাধু হাসতে লাগলেন অহঙ্কারী মুখে।

সন্ন্যাসী তখন বললেন, 'আচ্ছা সাধুবাবা, এই মরা হাতিটাকে আপনি আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারেন?'

সাধু তেমনি গর্বভরে বললেন, 'হ্যাঁ, তাও পারি।'

এই বলে তিনি আবার মন্ত্র পড়ে এক মুঠো ধুলো ঐ মরা হাতিটার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। আজব ব্যাপার—অমনি ঐ মরা হাতিটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী তাই দেখে সাধুকে বললেন, 'ওঃ, আপনার কি ক্ষমতা! কিন্তু সাধুবাবা, এই হাতিটার মরণ-বাঁচন তো হল, তাতে আপনার নিজের কি লাভ হল? আপনি কি ভগবানকে পেলেন?'

বলেই সন্ন্যাসী অদৃশ্য হলেন।

আর সাধু বসে বার বার ভাবতে লাগলেন তাঁর শেষের কথাকটি। তাঁর কানে তখনও সন্ন্যাসীর শেষ কথাটা বাজছে। আপনি কি ভগবানকে পেলেন?

[ঈশ্বরকে পাওয়াই হল শ্রেষ্ঠ পাওয়া, আর সব পাওয়ার কোন দাম নেই।]



।। আরো চাই, আরো ।।

গভীর বনে রাজার সঙ্গে সাধুর আলাপ হল। সাধুর মনের শান্তি, তাঁর পবিত্র ভাব এবং গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে রাজা মুগ্ধ হলেন। বারবার তিনি তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁর রাজ্যে কিছু দিন বাস করার জন্য।

সাধু তো কিছুতেই রাজার সঙ্গে যেতে চান না, তাঁর কোন জিনিসও নিতে চান না। হেসে বলেন, 'দেখ, বনে যে পরিমাণ ফলমূল আছে, আমার খাবার জন্য তত ফল লাগে না। পাহাড়ের পূব দিক থেকে নেমে আসা নদীর জল আমার তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। গাছের ছাল দিয়ে যে পরিধেয় তৈরি করি আমি, তা আমার লজ্জা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। আবার আমার থাকার জন্য গিরিগুহা যথেষ্ট ভাল জায়গা। কারুর কাছ থেকে কিছু চাওয়ার বা নেবার আমার দরকার পড়বে না রাজা।'

শুনে রাজা হতাশ হলেন। তবু অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি নন। বললেন 'প্রভু, আমি জানি আপনি নির্লোভ। তবু আপনি আমার একটা কথা রাখুন! আপনি আমার সঙ্গে মাত্র একবার রাজপ্রাসাদে চলুন এবং আমার কাছ থেকে সামান্য কিছু জিনিস গ্রহণ করুন।'

সাধু আর কি করেন। কিছুতেই রাজার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে শেষে তাঁর সঙ্গে রাজপ্রাসাদে এলেন।

রাজার সে কি আনন্দ! খুব ধুমধাম করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন তারপর একদিন সাধুকে দান করার জন্য প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। সাধুর সামনে জিনিসপত্রগুলি রেখে দান করার আগে বারবার ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে ভগবান, আমাকে আরও ধন দাও, আমাকে আরো ক্ষমতা দাও, আরো শক্তি দাও আমি যেন আরও সুখে কাল কাটাতে পারি... ..'

এভাবে চোখ বুঁজে দীর্ঘ প্রার্থনা করে যেতে লাগলেন রাজা। তাঁর সেই প্রার্থনা শেষ হবার আগেই সাধু নীরবে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

চোখ খুলে রাজা দেখলেন, সাধু চলে যাচ্ছেন, দৌড়ে এসে ধরলেন তাঁকে। তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললেন, 'আমার দান গ্রহণ না করেই চলে যাচ্ছেন প্রভু!'

সাধু হেসে বললেন, 'ভেবেছিলুম তুমি দেশের রাজা, বড় মানুষ, তাই তোমার কাছে দান গ্রহণ করতে এসেছিলুম। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার ভুল ভেঙ্গে গেল। দেখলুম, আমার চেয়েও বড় ভিখিরি তুমি, চাইছ তো চাইছই। তোমার চাওয়ার কোন শেষ নেই। ভিখিরির কাছ থেকে দান নেবো কি করে? তুমি ফিরে যাও রাজা, আর এসো না।'

[সংসারী মানুষের বাসনার শেষ হয় না কখনও।]





॥ সবার চেয়ে বড় ॥

সূর্য অস্ত যেতেই দিনের আলো নিভে গেল। সন্ধ্যে এল ঘনিয়ে। চারদিক অন্ধকার, শুরু হল ঝিঁঝিঁপোকার ডাক।

অমনি কোথা থেকে জোনাকিরা এসে হাজির। নিজেদের আলোয় ঝলমল করে তারা উড়ে বেড়ায় আর নিজেদের দেখে ভাবে, 'আমরা এসেছি বলেই এত আলো হল।'

একটু পরেই আকাশের বুকে দেখা দিল তারার মেলা। গোটা আকাশ ভরে গেল তারায় তারায় আর তাদের আলোয়। সেই আলোয় জোনাকিদের কেমন যেন মলিন দেখাতে লাগল।

দেখে গর্ব হয় তারাদের। তারা বলল, 'আমরা চারদিকে কত আলো ছড়াচ্ছি।' তাই না এত আলো।

খানিক পরে আকাশে উঠল চাঁদ।

পৃথিবী থেকে আকাশ সবই তখন ভেসে গেল জ্যোৎস্নাধারায়। আলোর হাট বসল যেন চারদিকে।

তাই দেখে চাঁদের মনে হল, 'কোথায় গেল তারার দল, আর তাদের আলো। আমায় দেখে লজ্জায় মুখ লুকায় তারা। সারা পৃথিবীকে এখন আলোয় ভরে দিয়েছি আমি।'

এক সময় রাত শেষ হল।

পূব দিক থেকে ধীরে ধীরে উঠল সূর্য। কি তার আলোর তেজ! সেই তেজের সামনে কোথায় মিলিয়ে গেল চাঁদ আর জ্যোৎস্না! সূর্য কিন্তু কোন কথাই বলল না বা অন্যের সাথে নিজের তুলনাও করল না। কেবল পৃথিবীকে আলো দিয়ে ভরিয়ে তুলল, রোজ যেমন করে।

[প্রকৃতই যে বড় তার কোন অহঙ্কার থাকে না।]



।। মহান পরীক্ষা ।।

মহর্ষি ব্যাস ছিলেন মস্ত বড় ঋষি। 'বেদান্ত সূত্র' লিখে খুব নাম করেছিলেন তিনি।

ব্যাসের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ—সকলেই ছিলেন খুব ধার্মিক। সিদ্ধ পুরুষ হবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা, কিন্তু হতে পারেন নি। এমন কি ব্যাস নিজেও সম্পূর্ণ সিদ্ধ হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর পুত্র শুকদেব সিদ্ধ হয়ে জন্মেছিলেন।



সেই শুকদেবকে ব্যাস নানা জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে আরও জ্ঞানী করে তুললেন। তারপর তাঁকে পাঠালেন জনকরাজের রাজসভায়।

জনক ছিলেন সেই আমলের সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজা। তাঁকে বলা হতো 'বিদেহ জনক'—অর্থাৎ যে জনক নিজের দেহের কথা ভুলে থাকতেন। সত্যিই তাই, রাজা হয়েও ভোগবিলাসে এতটুকু আসক্তি ছিল না তাঁর।

রাজা জনক জানতে পেরেছিলেন, ব্যাসদেবের ছেলে তাঁর কাছে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করতে আসছেন। তাই তিনি আগে থেকেই কয়েকটি ব্যবস্থা করলেন।

তাঁর নির্দেশমত বালক শুকদেব যখন রাজপ্রাসাদের দোরগোড়ায় এল, তখন কেউ তাঁর কোন খোঁজখবর নিল না। শুধু বসবার জন্য একটা আসন দেওয়া হল তাঁকে।

শুকদেব আর কি করেন, ঐ আসনে বসলেন।

পুরো তিনটে দিন, তিনটে রাত কেটে গেল। শুকদেব বসে আছেন তো আছেনই। কেউ তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলল না। একবারের জন্যও আলাপ করল না। তিনি কে, কোথা থেকে আসছেন, কি দরকার, কার খোঁজ করছেন—কেউ এসব কথা জিজ্ঞেস করল না। অথচ তিনি অত বড় একজন ঋষির ছেলে। সারা দেশে তাঁর পিতার কত সম্মান।

তিন দিন পর হঠাৎ একসময় রাজার মন্ত্রী আর তাঁর সঙ্গে পদস্থ কর্মচারীরা ওখানে হাজির। শুকদেবকে দারুণভাবে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁরা। তাঁকে নিয়ে আসা হল রাজবাড়ির ভেতরে, বসাল এক সাজানোগোছানো ঘরে। সুগন্ধি জলে স্নান করাল, খুব ভালো পোশাক পরিয়ে দিল। এভাবে আট দিন ধরে নানা বিলাসের মধ্যে তারা শুকদেবকে রেখে দিল।

এমন সুন্দর ব্যবহারের পরেও শুকদেবের গম্ভীর মুখে কিন্তু কেউ এতটুকু পরিবর্তন দেখতে পেল না। এতটুকু হাসি দেখতে পেল না কেউ তাঁর মুখে। প্রথম তিনদিন অবহেলায় অনাদরে যেমনটি ছিলেন, এখন জামাই আদরের মধ্যেও ঠিক তেমনটি নির্বিকার রইলেন।

আট দিন পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল রাজসভায়, রাজা জনকের কাছে।

জনক রাজা তখন সিংহাসনে বসে। চলেছে নাচ গানের আসর, সঙ্গীদের নিয়ে রাজা তা উপভোগ করছেন।

শুকদেবের সঙ্গে আলাপ করলেন রাজা। তারপর বললেন, 'এই দুধের বাটিটা নিয়ে তুমি সাতবার রাজসভা প্রদক্ষিণ কর। কিন্তু সাবধান! পরিপূর্ণ এই বাটি থেকে এক ফোঁটা দুধও যেন মাটিতে না পড়ে।'

সভায় তখন নাচ-গান চলছে, বাজনা বাজছে, নর্তকীরা নেচে

চলেছে। শুকদেব এরই মধ্যে সাতবার রাজসভা প্রদক্ষিণ করলেন, এক ফোঁটা দুধও পড়ল না।

মনের উপর শুকদেবের ছিল দারুন অধিকার। যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করতেন, ততক্ষণ কিছুতেই তাঁর মন অন্য জিনিসে আকৃষ্ট হতো না।

রাজা জনক শুকদেবের এই ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হলেন। পরম আদরে তাঁকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমি এতক্ষণ পরীক্ষা করেছি ঋষি, তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার ক্ষমতা, তোমার ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। বুঝেছি, তুমি সত্যকে উপলব্ধি করেছ। তোমার পিতা যা শিখিয়েছেন এবং তুমি যা শিখেছ, তার বেশি কিছু আমার জানা নেই। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'

[মনকে সংযত রাখা বড় গুণ। মানুষের জীবনে ইহাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।]





।। মুক্তিলাভের সময় ।।

মানুষের মধ্যে যেমন ঋষি বা বড় যোগী থাকেন, দেবতাদের মধ্যেও নারদ হলেন তেমন একজন মহাযোগী। সর্বত্র তিনি মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান।

একদিন এক বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে নারদ দেখলেন, একটি



লোক ধ্যান করছে। সে যে একাগ্রচিত্তে এবং অনেক দিন ধরে ধ্যান করছে, তা বোঝা গেল তার শরীর ঘিরে উইয়ের ঢিবি দেখে।

নারদ এসে দাঁড়াতেই লোকটি চোখ মেলে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

নারদ বললেন, 'বৈকুণ্ঠে।'

লোকটি তখন কাতরভাবে বলল, 'প্রভু, দয়া করে একবার ভগবানকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কবে আমায় কৃপা করবেন। আমি কবে মুক্তিলাভ করব।'

নারদ তাকে আশ্বাস দিলেন, 'বেশ, জিজ্ঞেস করব।'

তারপর এগিয়ে চললেন।

কিছুটা এগোবার পর নারদ দেখতে পেলেন আর একটি লোককে।

সে বেশ আনন্দে নাচ-গান করছিল। নারদকে দেখতে পেয়েই লোকটি দূর থেকে হাত নেড়ে তাকে ডাকল, 'ও নারদ! কোথায় চলেছ ?'

লোকটির কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গি পাগলের মত। তবু, জিজ্ঞেস যখন করেছে তখন উত্তর তো দিতেই হয়। নারদ বললেন, 'স্বর্গে যাচ্ছি।'

—তাই নাকি ? বেশ, বেশ! তাহলে একবার ভগবানকে জিজ্ঞেস কোরো, আমি কবে মুক্তি পাব।

নারদ শুনে মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

এরপর বৈকুণ্ঠ থেকে ফিরে নারদ আবার যাচ্ছিলেন ঐ পথ দিয়েই। উইঢিপি-চাপা সেই লোকটির সঙ্গে আবার দেখা হল। লোকটি সাগ্রহে নারদকে জিজ্ঞেস করল, 'দেবর্ষি, আপনি কি আমার কথা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?'

—হ্যাঁ, করেছিলাম।

—কি বললেন তিনি ?

—বললেন, মুক্তি পেতে এখনও তোমাকে চারবার জন্মাতে হবে।

—চার জন্ম!

লোকটি আর্তনাদ করে উঠল। তারপর বিলাপ করতে করতে বলল, 'আমি এমন ধ্যান করেছি যে আমার শরীর উইয়ের ঢিপি হয়েছে। হায়, হায়! তা সত্ত্বেও মুক্তি পেতে আমায় চার জন্ম অপেক্ষা করতে হবে!

কোন কথা না বলে নারদ এগিয়ে চললেন। এবার দেখা হল দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে। কি আনন্দেই না রয়েছে সে! নারদকে দেখেই বলল, 'কি, আমার কথা বলেছিলে ভগবানকে ?'

—বলেছিলুম। ভগবান বলেছেন, তোমার সামনে ঐ যে তেঁতুলগাছ দেখছ, ঐ গাছে যত পাতা আছে, মুক্তি পেতে হলে তোমাকে ততবার জন্মাতে হবে।

—তাই নাকি ? লোকটা নারদের কথা শেষ হতেই হাততালি দিয়ে উঠল—এত অল্প সময়ে আমার মুক্তি! কি আনন্দ, কি আনন্দ!

লোকটি আনন্দের চোটে লাফিয়ে উঠল। লোকটিকে অমন ব্যবহার করতে দেখে নারদ একটু অবাকই হলেন। মনে মনে ভাবলেন মাত্র চারবার জন্ম নিতে হবে শুনে আগের লোকটি আর্তনাদ করে উঠল। আর এই লোকটি আরো অসংখ্য বার জন্ম নিতে হবে শুনে কোন রকম দুঃখ প্রকাশ করল না। এখনও কেমন আনন্দময় রয়েছে। কি দারুণ ভাবে সদা হাস্যময়। এটাই হল লোকটির মহৎ গুণ। করুণাময় ঈশ্বর হয়ত একে দয়া করবেন। এরপর লোকটির সাথে অল্প দু একটা কথা বলে নারদ বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। একা দাড়িয়ে তখন লোকটি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দৈববাণী হল—বৎস, তুমি এই মুহূর্তে মুক্তি লাভ করবে।

[মুক্তি পাওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। অনেক পুণ্যের কাজ করলে তবে মুক্তি পাওয়া যায়। যে যত বেশি উতলা হবে, তার মুক্তি তত দূরে সরে যাবে।]



।। সব জানা হয়ে গেলে ।।

বাড়ির কর্তা বড় বিপদে পড়েছেন। একটা দরকারী চিঠি যে তিনি কোথায় রেখেছেন, মনে পড়ছে না কিছুতেই। খোঁজ, খোঁজ, সারা বাড়ি তোলপাড়। চিঠিটা সত্যিই খুব দরকারী। না পেলেই নয়।

একে জিজ্ঞেস করছেন। ওকে জিজ্ঞাসা করছেন, সকলেই বলছে, চিঠিটা দেখে নি। তাহলে! গেল কোথায় চিঠিটা ?

কর্তার চিন্তা এবং খোঁজাখুঁজি দুই বাড়ে, কারণ ওটা না পেলেই নয়। কুটুমবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাবার সময় এদিকে হয়ে এল। তত্ত্বের জন্য কি কি জিনিস কিনতে হবে, তা লেখা আছে ঐ চিঠিতে। মেয়ের মামা যত্ন করে একটা ফর্দ করে লিখে পাঠিয়েছেন।

বিপদ তো সেজন্যই বেড়েছে। চিঠিটা না পেলে তত্ত্বের কিছুই কেনা যাবে না। আবার কুটুমবাড়িতে ঠিকমত গোছগাছ করে তত্ত্ব না পাঠালে লজ্জায় পড়তে হবে। মেয়ের শ্বশুর বাড়ী বলে কথা।

বাড়িরও সবাই আতিপাতি করে খোঁজ শুরু করল।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল চিঠিখানা। কর্তা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। তাড়াতাড়ি পড়ে নিলেন লেখাটা।

একখানা ভালো কাপড়, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, একটা বড় মাছ, পান, ইত্যাদি সব লেখা আছে পরপর। গুছিয়ে লেখা, কোন কিছু ফস্‌কে যাবার উপায় নেই। কর্তামশায় ভাল করে মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন।

তারপর জিনিসগুলো কেনার জন্য বাজারের দিকে দৌড়লেন। বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কিনতে হবে জিনিসগুলো।

যে জন্য অত দেরি হল, সেই চিঠিটা কিন্তু সঙ্গে নিলেন না। একবার পরেই ওটা ফেলে দিলেন। এখন তাঁর চিঠির আর দরকার নেই। কি কি জিনিস লাগবে, তা তাঁর জানা হয়ে গেছে যে! চিঠিটা এখন তার কাছে বোঝা।

[শাস্ত্র, বই ইত্যাদি ভগবানের কাছে যাবার পথ বলে দেয়। পথ একবার জানা হয়ে গেলে তখন আর বইপত্রের দরকার হয় না।]

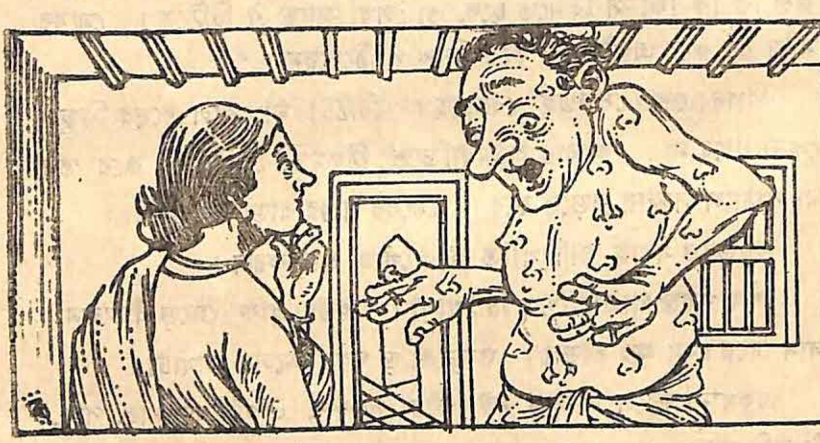


।। খাঁদা নাকই ভালো ।।

এক গরীবের ভক্তি দেখে দেবতা খুব খুশি হয়েছিলেন। একতাল কাদা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই কাদা দিয়ে ঢেলা তৈরি করে মাটিতে ছুঁড়ে দিও। ছোঁড়ার সময়ে যা চাইবে, তাই পাবে। তবে, কেবল তিনবার ফল পাবে, তার বেশি নয়।'

লোকটা তো মহা খুশি। তিন-তিনবার! তা তিন বারই বা কম কিসে? যা চাইবে তাই পাবে।

বাড়ি এসে লোকটা ঐ কাদার তাল তার বউকে দেখিয়ে সব কথা



বলল। বউ তো শুনে একরকম লাফালাফি শুরু করে দিল—কি বর চাওয়া যায়। কোনটা আগে চাইবে আর কোনটা পরে চাইবে তা ঠিক করতে বেশ সময় কেটে গেল। তারপর মন ঠিক করে তার বউ বললে, 'আমরা গরীব, তুমি প্রথমেই টাকাপয়সা চাও।'

লোকটা বললে, 'দেখ, বর তো আছে তিনটে, তাই প্রথমেই টাকা পয়সা চেয়ে কি হবে। তার চেয়ে বরং অন্য কিছু চাওয়া যাক। আমার নাক খাঁদা, লোকে আমাকে ঠাট্টা করে, তাই প্রথমে আমার নাকটাকে সুন্দর করা যাক। টাকায় তো আর শরীরের কুরূপ দূর হয় না!'

বউ কিন্তু আগেই অনেক টাকা করতে চাইছিল।

দুজনের মধ্যে তাই কাদার তাল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কাড়াকাড়ির মধ্যে খানিকটা কাদা পড়ে গেল মাটিতে। সেই সময় লোকটা বলে উঠল—আমার সুন্দর নাক হোক। আমি আর কিছু চাই না।

আশ্চর্য! কথাটা শেষও বোধ হয় হয়নি, অমনি ওর সর্বাঙ্গে সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি নাক হল। হাতে, বুকে, পিঠে, মাথায় কপালে সারাগায়ে ভর্ত্তি শুধু নাক, আর নাক।

লোকটা আর বউ দুজনেই তা দেখে অবাক বনে গেল। নাক চাইতে গিয়ে যে এমনভাবে নাকাল হতে হবে তা তারা ভাবতেও পারে নি।

উপায়ান্তর না দেখে তারা দ্বিতীয়বার কাদা ফেলে বললে, 'আমাদের সব নাক চলে যাক।'

যেই না এ কথা বলা, অমনি শরীর থেকে সব নাক চলে গেল। এমন কি, ওদের নিজেদের নাকদুটোও।

সর্বনাশ! দুটো বর তো হয়ে গেছে, এখন বাকি আছে তৃতীয় বর। এই সময়ে আবার নিজেদের নাকই নেই! তখন তারা ভাবল, এই খাঁদা নাকের বদলে যদি ভালো নাক চাই, তাহলে লোকে নিশ্চয়ই আমাদের ভালো নাক হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করবে। তাদের সব কথা তখন খুলে বলতে হবে। সব শুনে তারা আমাদের বোকা বলে ঠাট্টা করবে। বলবে, তিন তিনটে বর পেয়েও আমরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারলাম না। তার চেয়ে আমাদের খাঁদা নাকই ভালো।

এই ভেবে তারা তৃতীয়বার কাদা ছুড়ে তাদের খাঁদা নাকটাই ফেরৎ নিয়ে নিল এবং আগের মতই গরীব রয়ে গেল।

[হঠাৎ ভাগ্য ফিরে গেলে সাধারণ মানুষ কি করবে ভেবে পায় না। বেহিসেবী খরচ করে কিছুদিন পরে তারা আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে আসে।]



॥ নিজের কাছেই আছে ॥

এক ছিল নেশাখোর। তার তামাক খাবার সময়-অসময় বলে কিছু নেই।

তখন অনেক রাত। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল, তামাক খেতে হবে। কিন্তু টিকে ধরাবার আগুন নেই।

সে হাজির হল এক প্রতিবেশীর বাড়িতে।

কিন্তু তখন এত রাত যে, বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। নেশাখোর তখন দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল।

একজন দরজা খুলে দিল অনেকক্ষণ পরে। তাকে ঐভাবে এত রাতে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল—কি গো, এত রাত্তিরে কি মনে করে?

নেশাখোর নিজের নেশায় কথা কবুল করে বলল—আরে ভাই, জানোই তো, আমার তামাকের নেশা। তা আগুন নেই কোথাও, টিকে ধরাতে পারছি না। একটু আগুন দাও না!

শুনে বাড়ির লোকটি বলে উঠল—তুমি তো আচ্ছা লোক হে! এই জন্য এই রাতে এত দরজা ঠেলাঠেলি করলে! তোমার হাতেই তো লণ্ঠন রয়েছে!

তাই তো! নেশাখোর আর কথা বলবে কি, একেবারে চুপ!



॥ ভগবানই সত্য ॥

দেব-দ্বিজে বড় ভক্তি এক রাজার। ভগবানের কথা শুনতে বড় ভালবাসেন। এক পণ্ডিতকে তাই রেখেছেন রাজসভায়। তিনি রোজ রাজাকে ভাগবত পাঠ করে শোনান।

রাজা প্রতিদিন খুব মন দিয়ে ভাগবত শোনেন।

পড়ার পর পণ্ডিত প্রশ্ন করেন—রাজামশাই, বুঝেছেন তো?

অমনি রাজা তাকে পালটা বলেন—আপনি আগে বুঝুন।

রোজই এমনি কথা। পণ্ডিতমশাই মুখে আর কিছু বলেন না রাজাকে, কিন্তু রাজার কথাটা তাকে ভাবায়। রাজা নিজে কিছু উত্তর দেন না, উলটে তাকেই ভাবতে বলেন—এর মানে কি?

বাড়ি এসে পণ্ডিত অনেক ভাবেন। কিন্তু কেন যে রাজা কথাটা বলেন, তার কারণ বুঝতে পারেন না।

তবু ভাগবত পাঠের পর রাজাকে বলা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে —রাজামশাই, বুঝেছেন তো?

অমনি রাজা পালটা জবাব দেন—আপনি আগে বুঝুন।

পণ্ডিত রোজ এ কথা শুনেন, আর ভাবতে বসেন।

তবে, তিনি শুধু পণ্ডিত নন, ভক্ত মানুষ। পুজো-আচ্চা করেন। টাকাপয়সাও আছে। আবার সংসারেও রয়েছেন।

একদিন পুজোয় বসার আগে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হল, তাইতো টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র এসব তো আর মরার সময় সঙ্গে যাবে না! অথচ আমি এসব নিয়েই প্রতিদিন ব্যাস্ত থাকি। দিনের অনেকখানি সময় এতে আমার নষ্ট হয়ে যায়। ছি! ছি! আমি এতদিন এ কি ভুল করেছি। এর থেকে করুণাময় ঈশ্বরের চিন্তা বেশী করে যদি করতাম তার নাম গান করতাম, জীবন সার্থক হতো। আমি মূর্খের মত সাংসারিক সুখ, দুঃখ, টাকা, পয়সার চিন্তা করে সময় নষ্ট করে ফেলেছি। দিনের আলোর

মত সব কিছু তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো। বুঝতে পারল রাজার প্রতিদিনের সেই একই কথা। "আপনি আগে বুঝুন"। এতদিন পর সত্যি সে বুঝেছে রাজার কথা। উপলব্ধি করতে পেরেছে কথার মূল্য। আর নয়, অনেক দেরী হয়ে গেছে তবুও শুরু করা এখনি দরকার।

এই ভেবে পণ্ডিত সংসার ছেড়ে চলে গেলেন।

তবে যাবার আগে এক পণ্ডিতকে রাজার কাছে পাঠালেন। তাকে বললেন—ভাই, রাজাকে একটা কথা জানিয়ে দিও। বলো তাকে, এতদিন পর এবার আমি বুঝেছি।

নতুন পণ্ডিতের কাছে সব কথা শুনলেন রাজা। কিন্তু কোন কথা বললেন না। তাঁর মুখ দেখে সবার মনে হ'ল যেন তিনি মিটিমিটি হাসছেন।

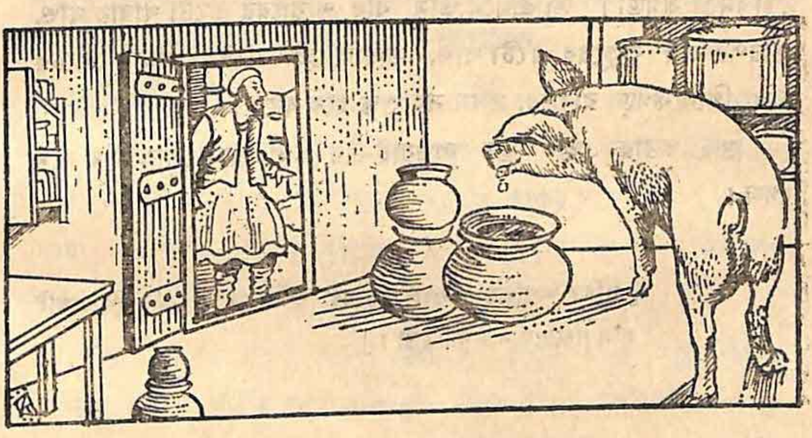
[শাস্ত্র, বই ইত্যাদি পাঠ করলেই শিক্ষা লাভ হয় না, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করাই হ'ল প্রকৃত শিক্ষা।]



।। শুদ্ধ করার দাওয়াই ।।

একদিন এক শূয়োর এক মুসলমানের বাড়িতে ঢুকে তার রান্না করে রাখা খাবার খেয়ে পালাল।

লোকটা ছিল গরীব। খেতে খুব ভালবাসত। হাতে কিছু বেশি পয়সা আসায় সেদিন সে বেশ ভালো ভালো কয়েকটা জিনিস রান্না করেছিল। রোজ তো আর ভালো-মন্দ খাওয়া হয় না, তাই মনে মনে



ঠিক করেছিল, সেদিন সে বেশ তৃপ্তি করে ভালো ভালো খাবার খাবে। কিন্তু এমনই তার পোড়া কপাল যে, খাবার তো সব গেলই, উলটে বাসনপত্র রান্নার জায়গা হয়ে গেল অপবিত্র। শূয়োরকে মুসলমানরা অপবিত্র জীব বলে মনে করে, তাই তার ছোঁয়া অশুচি বলে ধরা হয়।

এখন তার কি করা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে লোকটা ছুটল এক মোল্লার কাছে। তাঁকে বলল—সাহেব! আমার এক নিবেদন আছে।

মোল্লা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—বল।

—হুজুর, ভালো করে খাব বলে আজ ভালো ভালো জিনিস রান্না করেছিলাম। এক শূয়োর এসে সেগুলো খেয়ে গেছে, সব কিছু

অপবিত্র করে দিয়ে গেছে। আপনি যা হোক এর একটা বিহিত করুন।

মোল্লা সব শুনে কি যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন—দেখ, এর একমাত্র প্রতিকার হল, যে থালা থেকে শূয়োরটা খেয়ে গেছে, একটা কুকুর এনে তাকেও ঐ থালা থেকে একটু খাওয়ানো।

মোল্লার কথা শুনে কিছুই বুঝতে না পেরে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মোল্লা তখন তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—দেখ, শূয়োর-কুকুরে তো নিত্য ঝগড়া। তা প্রথমে তুমি যদি শূয়োরের এঁটো খাবার খাও, তারপর যদি কুকুরের এঁটো খাও, তাহলে দুই এঁটো তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে ঝগড়া বাধাবে, তখন সব শুদ্ধ হয়ে যাবে।

শুদ্ধ করার এই অদ্ভুত দাওয়াই-এর কথা শুনে লোকটি থ বনে গেল।

[পবিত্র অপবিত্র এ সবই মানুষের সৃষ্টি করা। মন শুদ্ধ রাখাই হ'ল সবচেয়ে বড় পবিত্রতা।]



।। বুদ্ধির জয় ।।

এক দেশের রাজা তার এক মন্ত্রীর ওপর খুব রেগে গেলেন। রাজার আদেশে এক উঁচু দুর্গের একেবারে ওপরের একটি ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়।

সে এক বিচিত্র কষ্টকর অবস্থা। অমন কাজের একটা মানুষের একটা বদ্ধ ঘরে একা একা থাকা—সে তো একরকম মৃত্যুরই সামিল। এদিকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবারও কোন উপায় নেই। মন্ত্রী তাই আর কি করেন, মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মন্ত্রীর অবস্থার কথা ভেবে তাঁর বউ আরও কষ্ট পাচ্ছিলেন। স্বামীর এই দুঃসময়ে যে তাঁর কাছে গিয়ে একটু সান্ত্বনা দেবেন, তারও উপায় নেই। কারণ রাজার আদেশ, মন্ত্রীকে কারুর সঙ্গেই দেখা করতে দেওয়া হবে না। মন্ত্রীর বউয়ের মনে তাই খুব দুঃখ। দিনরাত ভাবেন, কি করে স্বামীর সঙ্গে দেখা করা যায়।

শেষে একদিন তিনি সফল হলেন। দুর্গের যারা পাহারাদার, তাদের হাত করে গভীর রাতে চুপি চুপি মন্ত্রীর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে বললেন—প্রভু, আপনার অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। জানি না, কি ভাবে আপনাকে মুক্ত করা যাবে। তবে, যদি কোন উপায় আপনার জানা থাকে, আমায় বলুন, আমি চেষ্টা করব।

মন্ত্রী বললেন—এক কাজ কর। কাল রাতে একটা লম্বা কাছি, একগাছা শক্ত দড়ি, এক বাণ্ডিল সুতো, একটা গুবরে পোকা, খানিকটা খুব সূক্ষ্ম রেশমসুতো আর কিছুটা মধু এনে দিও আমাকে।

মন্ত্রীর বউ তো স্বামীর কথা শুনে অবাক। অনেক ভেবেও তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না, ওগুলো দিয়ে কি উপকার হবে। যাই হোক স্বামী যখন বলেছেন, তখন জিনিসগুলো তাঁকে পৌঁছে দিতেই হবে। তারপর উনি যা করার করবেন।

জিনিসগুলো নিয়ে মন্ত্রীর বউ পরদিন রাতেই পৌঁছলেন মন্ত্রীর সেই ঘরের কাছে। চুপি চুপি বললেন—প্রভু, জিনিসগুলো এনেছি।

মন্ত্রী বললেন—এবার তোমায় যা বলছি, তাই কর। গুবরে পোকাটার শুঁড়ে এক ফোটা মধু মাখিয়ে দাও, আর তার পায়ের সঙ্গে সরু রেশম সুতোটা বেঁধে দিয়ে তাকে ওপর দিকে মুখ করিয়ে দুর্গপ্রাচীরে ছেড়ে দাও।

মন্ত্রীর বউ তাই করলেন।

গুবরে পোকাটা সামনে মধুর গন্ধ পেয়ে তারই লোভে এগিয়ে যেতে লাগল। এভাবে মধুলাভের আশায় সে ধীরে ধীরে দুর্গের একেবারে ওপরে এসে হাজির হল।

মন্ত্রী ঐ পোকাটা ধরলেন। সেই সঙ্গে ঐ রেশমের সুতোটাও।

স্ত্রীকে বললেন—এবার রেশম সুতোর পেছনে শক্ত সুতোটা জুড়ে দাও।

স্ত্রী সেই রকম করতেই মন্ত্রী ধীরে ধীরে শক্ত সুতোটা টেনে তুললেন। ঠিক ঐ একই উপায়ে শক্ত কাছিটাও।

বাকি কাজ সহজ। ঐ দড়ির সাহায্যে মন্ত্রী দুর্গ থেকে পালালেন।

[বুদ্ধির জোরে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।]



॥ ভূতের আপোষ ॥

এক গরীব লোকের খুবই টাকাকড়ির দরকার ছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে কিছুতেই বাড়তি টাকা আয় করতে পারছিল না। কে বা কারা তাকে এই সময়ে বলল, সে যদি কোন উপায়ে একটা ভূত যোগাড় করতে পারে, তাহলে সেই ভূত তাকে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারবে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে একজন ধনী লোক হতে পারবে।

লোকটি সেই কথায় বিশ্বাস করে ভূতের খোঁজ দিতে পারে এমন একজন লোকের খোঁজ করতে লাগল।



একদিন এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হল। কথায় কথায় সে সাধুকে তার মনের কথা জানাল। যে তার একটা ভূত চাই।

সাধু বললেন—ভূত নিয়ে তুমি করবে কি ?

সে বলল—তাকে দিয়ে আমার সব দরকারী জিনিসপত্র আনিয়ে নেব। দয়া করে আপনি আমায় ভূতকে আনার উপায় বলে দিন।

সাধু কিন্তু সব শুনেও কেমন যেন নির্বিকার রইলেন। বললেন—অমন পাগলামি কোরো না বাড়ি যাও।

লোকটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে সাধুর হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল। বলল—দোহাই আপনার, আমাকে একটা ভূত আনার ব্যবস্থা করে দিন। আমি জানি, আপনার অনেক ক্ষমতা। আর, আমিও বড় গরীব।

ক্রমাগত লোকটির মুখ থেকে একই কথা শুনতে শুনতে সাধু একটু বিরক্তই হলেন। শেষে বললেন—এই নাও যাদুমন্ত্র, এটা জপ কর। এটা জপ করলেই ভূত আসবে। তাকে তুমি যা করতে বলবে, সে তাই করবে। তবে, একটা কথা। ভূতেরা খুব সাংঘাতিক হয়, তাদের সব সময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হয়। তুমিও যদি এই ভূতকে সব সময়ে কাজ দিতে না পার, বা তাকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে না পার তাহলে সে কিন্তু তোমার ঘাড় মটকে দেবে।

লোকটা কিন্তু তখন ওসব কথা ভাবছিলই না।

ভূত পাচ্ছে, এটাই তার কাছে তখন বড় ব্যাপার। মনে মনে খুশি হয়ে ভাবল, কাউকে একটানা কাজ দেওয়া আবার একটা সমস্যার ব্যাপার নাকি? ভূতকে আমি এমন কাজ দেব যে সারা জীবন সে মাথা তোলারই ফুরসত পাবে না।

এই ভেবে সে বনে গিয়ে সাধুর দেওয়া মন্ত্র জপ করতে লাগল।

সাধু যা বলেছিলেন, তাই হল। একটু পরেই তার সামনে হাজির হল এক ভূত। গম্ভীর গলায় সে বলল—আমি ভূত। তোমার মন্ত্রে বশ্যতা স্বীকার করে তোমার কাছে এসেছি। এখন তুমি আমায় কাজ দাও। সব সময় কাজ দিতে হবে আমাকে। যদি না দিতে পার তাহলে আমি তোমায় মেরে ফেলব।

লোকটি বলল—আমার জন্য একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করে দাও।

যেই না বলা, অমনি অবাক কাণ্ড, লোকটি দেখল, ভূত সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি তৈরি করতে শুরু করে দিল। কিছু সময়ের মধ্যেই একটা সুন্দর বিরাট বাড়ি বানিয়ে ফেলল সে।

ভূত বলল—এই নাও তোমার বাড়ি। এবার কি করতে হবে।

লোকটা খুব গরীব। টাকাপয়সার ওপরে তার দারুণ লোভ। তাই সে বলল—এবার টাকা আনো।

অমনি ভূত কোথা থেকে কাড়ি কাড়ি টাকার বস্তা এনে ফেলতে লাগল। ফেলছে তো ফেলছেই। দেখে শেষ পর্যন্ত লোকটাই বলল—আর থাক। এখন আর টাকা চাই না।

—তাহলে বল, এবার কি করতে হবে। ভূত বলে উঠল।

—এই বন কেটে একটা শহর বানিয়ে দাও।

লোকটা ভেবেছিল, শহর তৈরি করতে ভূতের বুঝি বছরের পর বছর সময় লাগবে। কিন্তু তার হিসেবে ভুল হয়েছিল। ভূতেরা এমনিতেই খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে, আর এই ভূতটা যেন আরও চটপটে। দৌড়ঝাপ করে, খুব তাড়াতাড়ি বনজঙ্গল সাফ করে দিন কয়েকের মধ্যে সে একটা শহর বানিয়ে ফেলল।

লোকটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল—শহর তৈরি হয়ে গেছে। এবার বল, কি করতে হবে।

লোকটা এবার পর পর হুকুম করতে লাগল—জিনিসপত্র এনে দাও, খাবার এনে দাও, দাসদাসী এনে দাও।

বলতে দেরি আছে তো ভূতের কাজ করতে দেরি নেই। যা বলছে ঠিক ঠিক মত সব এনে হাজির করছে। তার কাছে এসব কোন ব্যাপারই না।

এবার খুব চিন্তায় পড়ে গেল লোকটা। তার মাথায় যত রকম কাজের কথা ছিল, সে সবই বলেছে—এবার কি করতে বলবে ওকে ?

এরই মধ্যে ভূত কিন্তু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে চোখ রাঙিয়ে বলে—কই, কাজ দাও!

—আর তো কাজ নেই।

লোকটা হতাশ হয়ে বলে উঠল।

ভূত ধমকে উঠল—ওসব শুনতে চাই না, আমায় কাজ দাও। নইলে তোমার ঘাড় মটকে দেব এখুনি।

শুনে লোকটার চোখ তো কপালে ওঠার দাখিল। প্রাণভয়ে সে এবার দৌড় লাগাল। দৌড়তে দৌড়তে সে এসে হাজির হল সেই সাধুর কাছে। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল—প্রভু, আমাও বাঁচান।

—কি হল ? সাধু জিজ্ঞেস করেন।

—খুব বিপদে পড়েছি প্রভু! ভূতকে আমি যে কাজ দিই, সে তা মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলে। এখন আর তাকে দেবার মত কোন কাজ নেই। অথচ ভূত তা শুনতে চাইছে না। সে বলছে কাজ না দিলে আমায় মেরে ফেলবে।

এর মধ্যে সেই ভূতও সেখানে এসে হাজির।

সাধুর সামনেই সে লোকটাকে চোখ রাঙিয়ে বলল—কই, কাজ দাও আমায়! না দিলে এখুনি তোমায় মেরে ফেলব।

নিজের বিপদের কথা ভেবে লোকটিতো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সাধুর পা জড়িয়ে ধরে বলল—আমায় বাঁচান প্রভু। দেখছেন তো, ভূতটা আমাকে কি করতে চাইছে।

লোকটার অবস্থা দেখে সাধুর মনে দয়া হল। বললেন—ঠিক আছে, চিন্তা কোরো না, আমি একটা উপায় বলে দিচ্ছি। ঐ যে দূরে একটা কুকুরকে দেখছ, তার লেজটা বাঁকা। তুমি ওর লেজটা কেটে এনে ভূতকে বল ওটা সোজা করে দিতে।

লোকটি তখুনি তার তরোয়ালের এক কোপে কুকুরটার লেজ কেটে ফেলল। কাটা লেজটা তারপর ভূতের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—এটা সোজা কর।

হাতে কাজ পেয়ে ভূত তখুনি বসে পড়ল বাঁকা লেজকে সোজা করতে। ধীরে ধীরে ওটাকে সোজা করল সে, কিন্তু যেই ছেড়ে দিল অমনি আগের মত ওটা গুটিয়ে গেল। এভাবে যতবার লেজটাকে সোজা করে, ছেড়ে দিলে ততবারই সেটা বেঁকে যায়।

এভাবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চেষ্টা করে যেতে লাগল ভূত। কিন্তু লেজ আর কিছুতেই সোজা হয়ে থাকে না। বিরক্ত হয়ে ভূত বলে—ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল তো! আমি পুরনো পাকা ভূত, এত কাজ করে এলুম, আর এখন এই সামান্য কাজটুকু করতে পারছি না! সাগর পেরিয়ে এসে শেষে গরুর খুরের গর্তে ডুবে মরব নাকি?

কিন্তু নিজের মনেই বিড় বিড় করা সার হয় ভূতের কাজের কাজ আর হয় না। লেজ আর সোজা হয় না কিছুতেই। শেষে ভূত হাত জোড় করে লোকটাকে বলল—আমার হার হয়েছে ভাই,

এসো, আপোষ করি। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি আর আমি তোমাকে যা যা করে দিয়েছি, সেগুলো সব তোমারই থাক। কথা দিচ্ছি, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। এ কথা বলে ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহা আনন্দে ভূতের সঙ্গে সেই চুক্তি করল লোকটা।



॥ মাহুত ও নারায়ণ ॥

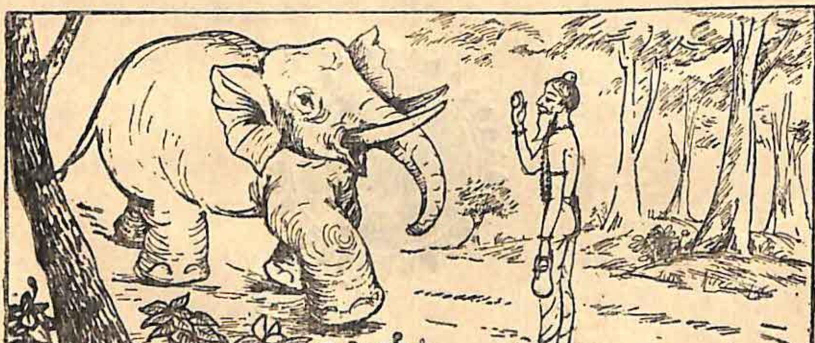
সাধু তাঁর শিষ্যদের নানা ধর্মকথা বলতেন। তার মধ্যে একটা কথা খুব বেশি করে বলতেন, 'সব জীবের মধ্যেই নারায়ণ আছেন।'

তাঁর এক শিষ্য কথাটা খুব মনে রেখেছিল।

একদিন সে চলেছে পথ দিয়ে। এমন সময় সোরগোল উঠল, 'পালাও, পালাও, পাগলা হাতি আসছে।

শুনেই লোকজন রাস্তা থেকে ছুটে পালাতে লাগল।

সেই শিষ্য কিন্তু ভাবল, পালাব কেন। গুরুদেব বলেছেন, সব জীব নারায়ণ। হাতিও তাহলে নারায়ণ।



এদিকে খ্যাপা হাতি তার সামনে এসে পড়েছে।

লোকটির মনে তখনও সেই ভাব: হাতিই নারায়ণ। সে তাই হাত জোড় করে হাতিকে স্তব করতে লাগল।

ওদিকে হাতির পিছনে ছুটতে ছুটতে আসছে মাহুত। চিৎকার করছে সমানে—পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও! এ হাতি ক্ষেপে গেছে।

শিষ্য কিন্তু মাহুতের কথা শুনেও হাত জোড় করে দাঁড়িয়েই

রইল। হাতি তাকে সামনে পেয়ে শুঁড়ে জড়িয়ে এক আছাড় মেরে চলে গেল।

বেচারীর তো ভীষণ লাগল। ভাগ্যগুণে প্রাণটা বাঁচল বটে, কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

হাতি চলে যেতে লোকজন শিষ্যটিকে ধরাধরি করে নিয়ে এল সাধুর আশ্রমে। সেখানে অনেক সেবা-যত্নের পর তার জ্ঞান ফিরে এল। একটু সুস্থ বোধ করল সে। চোখ মেলে চাইল।

গুরুদেব বললেন—কি হয়েছিল? এ কাজ করতে গেলে কেন?

শিষ্য সব ঘটনা তাঁকে জানিয়ে বলল—প্রভু, আপনি বলেছিলেন, সব জীব নারায়ণ। তাই হাতি-নারায়ণকে দেখে আমি পালিয়ে যাই নি।

সাধু হেসে বললেন—কিন্তু, মাহুতও তো নারায়ণ। ঐ নারায়ণ তো তোমায় সাবধান করে দিয়েছিল, তার কথা তুমি শুনলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথা শুনলে আজ তোমার এই অবস্থা হতো না।



॥ চোরও সাধু হয় ॥

এক জেলের স্বভাব ছিল অন্য লোকের পুকুর থেকে মাছ চুরি করা। রাতে সবাই যখন ঘুমতো, তখন সে তার কাজ হাসিল করত।

এক রাতে ঐ জেলে একজনের পুকুরে জাল ফেলেছে।

যার পুকুর, সে সজাগ ছিল। জাল ফেলার শব্দ শুনেই সে লোকজন নিয়ে হৈ-হৈ করে হাজির হল পুকুরপাড়ে। এসে দেখে, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোরকে ধরতে তাই সে লণ্ঠন জ্বালাল।

জেলে দেখল, ধরা তো পড়তেই হবে, তবু একটা শেষ চেষ্টা করা যাক। যদি বাঁচতে পারি। লোকেরা যখন লণ্ঠন ধরাতে ব্যস্ত, সে তখন জাল ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে বসল এক গাছের তলায়। মুখে-হাতে-গায়ে ছাই মেখে সাধু সেজে রইল।

এদিকে লোকেরা চোর খুঁজতে খুঁজতে লণ্ঠনের আলোয় দেখল, গাছতলায় এক সাধু বসে। চোখ বুজে তিনি ধ্যান করছেন। তাঁর সারা গায়ে ভস্ম মাখা।

সাধুকে তো আর চট করে চোর বলা যায় না। তাই কারো কারো একটু আধটু সন্দেহ হলেও তারা কেউই তাকে কিছুই বলল না। তাঁর ধ্যানও ভাঙ্গাল না।

পরের দিন লোকের মুখে মুখে রটে গেল, পুকুরপাড়ে বড় গাছটার তলায় মস্ত বড় এক সাধু বসে আছেন। কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, নিজের মনে তিনি শুধু ধ্যান করে চলেছেন।

শুনে সাধুকে দেখতে আর প্রণাম করতে কত যে লোক আসতে লাগল তার ঠিক নেই। তারা সাধুর পায়ের কাছে নানারকম ফুল-ফল-মিষ্টি দিয়ে গেল। অনেকে টাকাপয়সাও দিতে লাগল।

জেলের কিন্তু তখন কোনদিকে দৃষ্টি নেই। সে চোখ বুজে ঠায় বসে রইল সন্ন্যাসী সেজে। না থেকে অবশ্য উপায়ও ছিল না। একবার

যদি লোকেরা বুঝতে পারে সে ভণ্ড, পিঠের চামড়া তাহলে আর আস্ত থাকবে না।

এক সময়ে সবাই চলে গেলে চোখ মেলে তাকাল জেলে। সামনে ফুল-ফল টাকাপয়সার স্তুপ। কিন্তু সেদিকে জেলে নজরই দিলে না। অবাক হয়ে সে তখন ভাবছিল একটা কথা : আমি চোর,ভণ্ড সাধু, তাতেই লোকে এত খাতির করল। তাহলে যদি সত্যিই সাধু হই, তাহলে লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা তো পাবই এমনকি ভগবানকেও পেতে পারি।

এই চিন্তা আসা মাত্রই জেলে চুরি ছেড়ে দিয়ে সাধু হবার চেষ্টা শুরু করল।

[খারাপ লোকও সৎ চিন্তা শুরু করলে তার সব অসৎ চিন্তা দূর হতে থাকে এবং এভাবে কিছুদিন চলার পর সে একদিন সত্যিকারের সৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।]





।। খোদার কাছেই চাইব ।।

কুঁড়ে ঘরে থাকেন এক ফকির। নিজের বলতে তাঁর কিছুই নেই। কিন্তু বহু লোক আসে তাঁর কাছে। তারা তাঁর ভক্ত।

একদিন ফকিরের মনে হল, এত লোক আসে আমার কাছে—কাউকে কিছু খাওয়াতে পারি না, অতিথি-সৎকার হয় না। এসব করতে, পারলে ভালো হতো।

কিন্তু অতিথি-সৎকার করতে হলে তো চাই টাকাপয়সা। তাঁর তো কিছুই নেই। ফকির তাই ঠিক করলেন, তিনি বাদশার কাছে যাবেন। তাঁর অনেক আছে, চাইলে নিশ্চয়ই দেবেন।

এই ভেবে ফকির হাজির হলেন বাদশার কাছে।

বাদশা তখন নমাজে বসেছেন। এ সময়ে তো আর কথা বলা যায় না। ফকির তাই অপেক্ষা করতে লাগলেন। চেয়ে রইলেন বাদশার দিকে।

এক সময়ে নমাজ শেষ হল। ফকির দেখলেন, বাদশা এবার প্রার্থনা করছেন : 'খোদা! তুমি আমাকে দৌলত দাও, ধন দাও, নতুন নতুন রাজ্য দাও……'

শুনেই ফকির উঠে পড়লেন।

বাদশা সেই সময় তাঁকে দেখতে পেয়ে ইশারায় বসতে বসলেন। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ বসেছিলেন, কিন্তু আমায় কিছু না বলে চলে যাচ্ছেন কেন?'

ফকির বললেন, 'তা আর বাদশায় শুনে কাজ নেই। আমি চলে যাই।'

বাদশা বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি কথা! কিছু না বলে চলে যাবেন? আমি ছাড়ব না, আমাকে বলতেই হবে কি জন্য এসেছিলেন।'

'তাহলে শুনুন। 'আমার কাছে অনেক লোকজন আসে। তাদের খাওয়াবার জন্য আপনার কাছে কিছু টাকা চাইতে এসেছিলুম।'

'না চেয়েই চলে যাচ্ছেন যে?'

ফকির এবার হেসে বললেন, 'দেখলুম, আমার মত আপনিও চাইছেন, অন্যের কাছে। রাজা বললেন, কিন্তু আমিতো চাইছি দিন-দুনিয়ার মালিকের কাছে। কোন লোকের কাছে নয়।

উত্তরে ফকির আবার হেসে বললেন তাই এখানে এসে আমার ও সে ভুল ভেঙ্গে গেছে রাজা, যদি চাইতেই হয় তো চাইব দুনিয়ার সেরা ধনীর কাছে। খোদার কাছে, আপনার কাছে নয়। কেননা আপনার আমার উভয়ের একই অবস্থা।

[মানুষকে সব কিছু দেবার মালিক ঈশ্বর। তাঁর কাছেই আমাদের সব প্রার্থনা করা উচিত।]





॥ মানুষ কখন বিশ্বাস করে ॥

এক কবিরাজের খুব নামডাক। দিনরাতই তাঁর বাড়িতে রোগীর ভিড় লেগেই আছে।

সেদিন একটি লোক এল তাঁকে দেখাতে। কবিরাজ তাঁকে পরীক্ষা করলেন, ওষুধ দিলেন, কিন্তু কি পথ্য খেতে হবে. তা বললেন না। বললেন, 'আপনি কাল আসুন। তখন আপনাকে আপনার পথ্যের কথা বলব।'

রোগী একটু হতাশ হলেন। বললেন, 'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, তাই পথ্যের ব্যবস্থাটা যদি আজ বলে দিতেন, ভালো হতো।'

কবিরাজ মাথা নাড়লেন, 'না, আজ নয়। অন্য যেদিন আপনার সুবিধে হবে, আসবেন।'

রোগী আর কি করে, চলে গেল।

দিন কয়েক পরে লোকটি যখন এল, তখন কবিরাজ তাকে বলে দিলেন খাবার সব বিধি নিষেধ। সেই সঙ্গে বললেন, 'গুড় একদম খাবেন না। ঐ জিনিসটি খেলে আপনার রোগ কিন্তু সারবে না।'

রোগী সব শুনে চলে যাবার পর ঘরে উপস্থিত এক ভদ্রলোক বললেন, 'কবিরাজমশাই, এই সামান্য কথাটা তো ওকে এর আগের দিন বলতেই পারতেন। সেজন্য আজ আবার বেচারীকে কষ্ট করে আনালেন কেন?'

কবিরাজ হেসে বললেন, 'তারও একটা কারণ আছে। রোগীটি যেদিন এসেছিল, সেদিন এ ঘরে অনেকগুলি গুড়ের কলসী ছিল। সেদিন যদি ওকে গুড় খেতে নিষেধ করতাম তাহলে কথাটা ওর মনে ধরত না। ভাবত, কবরেজমশাই নিজে দিব্যি গুড় খাচ্ছেন আর আমায় খেতে মানা করছেন।' আজ আমি গুড়ের সব কলসী সরিয়ে ফেলেছি এবার সে আমার কথা বিশ্বাস করবে।'

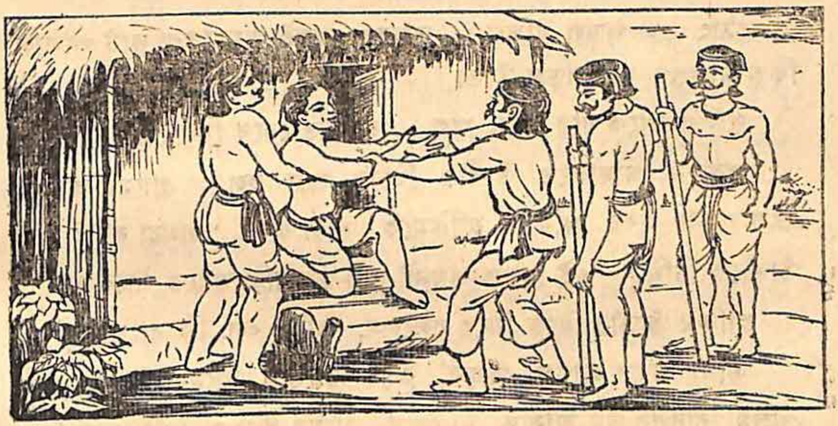
[নিজে ঠিক থেকে, তবেই অন্যকে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে।]



।। সবই রামের নামে ।।

এক ছিল ধার্মিক তাঁতী। সে কখনও মিথ্যে কথা বলত না, কারুর ক্ষতি করত না। সকলেই তাই ভালবাসত তাকে।

তাঁতী গ্রামে থাকে, আর হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রি করে। ভগবান রামের সে পরম ভক্ত। মনেপ্রাণে সে বিশ্বাস করে, তার সব কাজই রামের ইচ্ছেয় হয়, এমন পড় বেচা পর্যন্ত।



খদ্দের কাপড়ের দাম জিজ্ঞেস করলে তাঁতী বলে, 'আজ্ঞে, রামের ইচ্ছেয় এ কাপড়ের দাম চল্লিশ টাকা।'

'এত দাম ?'

তাঁতী বুঝিয়ে দেয়, 'রামের ইচ্ছেয় সুতোর দাম পঁচিশ টাকা, রামের ইচ্ছেয় এর মজুরি দশ টাকা, আর রামের ইচ্ছেয় লাভ পাঁচ টাকা।

খদ্দের তার কথায় বিশ্বাস করে কাপড় কিনে নিয়ে যায়।

তাঁতী সারাদিন কাজ করে ধর্মপথে থেকে, আর রাতে শোবার আগে ভগবানের নাম করে। তাঁর কথা মনে রাখে।

একদিন রাত্তিরে হল কি, তাঁতীর ঘুম আসছিল না কিছুতেই। বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে সে উঠে এল চণ্ডীমণ্ডপে। সেখানে বসে সে তামাক খেতে লাগল।

এমন সময়ে একদল ডাকাত যাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে। তারা ডাকাতি করতে বেরিয়েছে।

লুটের মাল বইবার জন্য একজন মুটে দরকার। তাঁতীকে দেখে ডাকাতের সর্দার বলল, 'তুই আমাদের সঙ্গে চল!'

তাঁতী অনেক অনুনয়-বিনয় করল, 'দোহাই তোমাদের, আমায় যেতে বোলো না।'

কিন্তু ডাকাতের দল তার কথা শুনলে তো। তারা তাকে জোর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

তারপর তারা ডাকাতি করল এক বাড়িতে। আর, লুঠ-করা জিনিসপত্র তাঁতীর মাথায় চাপিয়ে ফিরে চলল।

হঠাৎ এসে পড়ল পুলিশ। তাদের দেখেই ডাকাতরা ছুটে পালাল, কিন্তু মালশুদ্ধ ধরা পড়ল তাঁতী।

পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। হাজতে রেখে দিল সে রাতটা।

পরদিন আদালতে তাঁতীর বিচার শুরু হল। গ্রামের অনেকে এসে পড়ল খবর শুনে। হাকিমকে তারা বলল, 'আমরা সবাই এই তাঁতীকে চিনি। এই লোক কখনই চুরি-ডাকাতি করতে পারে না।'

হাকিম তাঁতীর দিকে ফিরে বললেন, 'তুমিই বল, কি ব্যাপার ?'

তাঁতী বলতে লাগল, 'হুজুর' কাল রাত্তিরে রামের ইচ্ছেয়, ভাত খেলুম, তারপর ঘুম আসছে না দেখে, রামের ইচ্ছেয়, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসলুম, এমন সময় রামের ইচ্ছেয়, একদল ডাকাত এল। তারা রামের ইচ্ছেয়, ধরে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর তারা রামের ইচ্ছেয় এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করল। রামের ইচ্ছেয় আমার মাথায় চাপিয়ে দিল লুটের মাল। হঠাৎ রামের ইচ্ছেয় পুলিশ এসে পড়ল। ডাকাতরা পালিয়ে গেল, আর রামের ইচ্ছেয় আমি ধরা পড়লুম। পুলিশরা, রামের ইচ্ছেয়, হাজতে রেখে দিলে আমায়। তারপর রামের ইচ্ছেয়, এখন হুজুরের কাছে নিয়ে এসেছে।

হাকিম বুঝতে পারলেন, লোকটির সব কথাই সত্যি, সে নির্দোষ। তিনি হুকুম দিলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও।'

তাঁতী বাইরে এসে গ্রামের লোকদের বললে, 'রামের ইচ্ছেয় আমায় ছেড়ে দিয়েছে।'



॥ সুখ-দুঃখের অংশীদার ॥

এক জায়গায় থাকতেন কয়েকজন সাধু। এক একদিন ভিক্ষায় বেরোতেন এক একজন। যা পেতেন তাতেই সেদিন সকলের খাওয়া হতো। তাতেই খুশী থাকতেন তাঁরা।

এমনি একদিন ভিক্ষায় বেরিয়েছেন একজন।

পাশের গাঁয়ে এসে দেখলেন, জমিদার একজনকে খুব মারছে।

দেখে সাধুর খুব মায়া হল। জমিদারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন 'আহা-হা, আপনি বেচারীকে এমন মারছেন কেন? আর মারবেন না।'

জমিদার একেই দারুণ রেগে ছিল, এবার সাধুর কথায় সব রাগ গিয়ে পড়ল তাঁরই ওপর। বেশ উত্তম-মধ্যম কয়েক ঘা বসিয়ে দিল তাঁকে।

বেধড়ক মারের চোটে সাধু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

তাই দেখে কে একজন সাধুদের ডেরায় খবর দিল, আপনাদের এক সাধুকে জমিদার খুব মেরেছে। তিনি পথে পড়ে আছেন।'

শুনেই ছুটে এলেন জনকয়েক সাধু। তাঁকে ধরাধরি করে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে এলেন।

বেশ খানিকটা সেবাশুশ্রূষার পর সাধুর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন, একজন একটু দুধ দিলেন তাঁর মুখে।

আর একজন বললেন, 'দেখি, কি রকম জ্ঞান হয়েছে!'

বলে তাঁর কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, কে আপনাকে দুধ খাওয়াচ্ছে বলুন তো?'

সাধু আস্তে আস্তে বললেন, যিনি তখন মেরেছিলেন, তিনিই এখন আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন!'

[ঈশ্বর এক হাতে দমন করেন অপর হাতে তিনিই আবার রক্ষা করেন।]

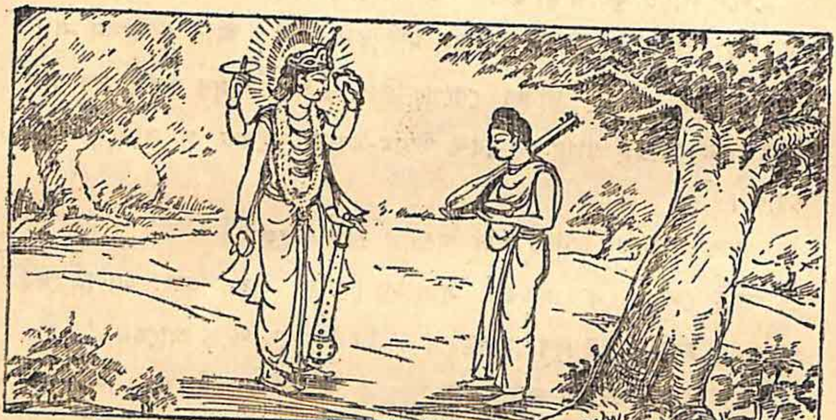


॥ কে বড় ভক্ত ॥

নারদ হলেন দেবর্ষি। একদিকে তিনি দেবতা, অন্যদিকে ঋষি। ঢেঁকি তাঁর বাহন। ঢেঁকিতে চড়ে তিনি আকাশ পথে ঘুরে বেড়ান।

এহেন নারদ হলেন বিষ্ণুর বড় ভক্ত। দিনরাত বিষ্ণুর স্তব করেন।

নারদের স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু একদিন বলেছিলেন—নারদ, বর চাও, যা চাইবে, তুমি তাই পাবে।



নারদ বললেন—প্রভু, আমার ওপর যদি তোমার সত্যিই দয়া হয় তাহলে আমাকে এমন বর দাও যেন চিরকাল তোমার প্রতি আমার ভক্তি অটুট থাকে।

—থাকবে। আরো কিছু চাও।

—আর কিছুই আমি চাই না।

এমন ভক্ত নারদ। এই নিয়ে তাঁর নিজের মনেও একটু অহঙ্কার ছিল—আমার মত ভক্তি আর কার আছে?

ভগবান তো অন্তর্যামী। তিনি বুঝতে পারেন নারদের মনের ভাব। অহঙ্কার জেগেছে ওঁর মনে—ওটা ভাঙ্গতে হবে।

একদিন নারদকে ডেকে বিষ্ণু বললেন, 'নারদ, মর্ত্যে আমার এক

বড় ভক্ত আছে। তুমি একবার তার কাছে যাও, কথা বলে দেখ।' বললেই বুঝতে পারবে যে সে কত বড় ভক্ত।

নারদের মনের অহঙ্কার একটু ধাক্কা খেল। আশ্চর্য হয় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বড় ভক্ত? কোথায়?'

ভগবান বলে দিলেন তার ঠিকানা।

নারদ ঢেঁকিতে চেপে তখুনি উড়ে গেলেন সেখানে, এসে দেখেন সে একজন সাধারণ চাষী। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন, লোকটি ভোরে উঠে ঘুম ভাঙ্গার ঠিক পরেই একবার হরিণাম করে, তারপর লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যায়। সারাদিন চাষ করে মাঠে। এরপর বাড়িতেও তার কাজ থাকে। সেসব সেরে সে শুয়ে পড়ে রাতের বেলা। সেই সময় সে আর একবার হরিনাম করে।

নারদ চাষীর সব কথা শুনে ভাবলেন, এই আবার ভক্ত! সারাটা দিন তো মাঠে আর সংসারের কাজেই কাটিয়ে দেয়। আমার মতন তো দূরের কথা, যে কোন সাধারন ভক্তও এর চেয়ে বেশিবার ভগবানের নাম করে। অথচ ভগবান একেই বলছেন বড় ভক্ত!

বিষ্ণুর কাছে ফিরে এসে নারদ ঠাট্টা করে বললেন, 'দেখে এলুম তোমার ভক্ত চাষাকে। সারা দিনে মোটে দুবার হরিণাম করে!'

মনে মনে হাসলেন ভগবান। নারদকে বললেন, 'খানিক পরে তুমি একবার আমার কাছে এসো তো।'

নারায়ণের কথা মত নারদ একটু পরে তাঁর কাছে এলে, ভগবান তখন তাঁর হাতে একটা তেলভর্তি বাটি দিয়ে বললেন, 'এই তেলের বাটিটা হাতে করে তুমি আমার বাড়ি সাতবার ঘুরে এসো তো। কিন্তু দেখো, এক ফোঁটা তেলও যেন বাটি থেকে বাইরে না পড়ে।' খুব সাবধান।

নারদ তো বাটি হাতে বেরোলেন। কাজটা মোটেই সহজ নয়। কানায় কানায় ভর্তি তেল, একটু অন্যমনস্ক হলেই তেল পড়ে যাবে, আর তাহলেই ভগবানের আদেশ অমান্য করা হবে। খুব কঠিন কাজ। খুব সামলে নারদ তাই কোনরকমে বিষ্ণুর বাড়ির চারপাশ সাতবার ঘুরে এসে তাঁর সামনে তেলের বাটিটা রাখলেন।

নারদের তখন যাকে বলে গলদঘর্ম অবস্থা। বিষ্ণু তাই দেখে হেসে বললেন, 'কি গো নারদ, ঘুরে এলে?' খুব ঘেমে গেছ দেখছি।

কপাল আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে নারদ বললেন, 'হ্যাঁ প্রভু, ঘুরে এলাম। উঃ! একটা কাজ দিয়েছিলেন বটে!'

ভগবান আবার মুচকি হেসে নারদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাটি হাতে ঘোরার সময় তুমি কবার আমার নাম উচ্চারণ করেছিলে নারদ?'

নারদ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'একবারও নয়।' তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে অজুহাত দেখালেন, 'কি করে আপনার নাম করব? বাটি ভর্তি তেল সামলাতে হল যে! তাই তখন তেল ছাড়া অন্য কোথাও মন দিলেই অন্যমনস্ক হয়ে যেতুম, আর তেল পড়ে যেত। আপনি বলে দিয়েছিলেন এক ফোটা তেল মাটিতে পড়লে চলবে না। তাই—'

বিষ্ণু তখন হেসে বললেন, 'এবার তাহলে বোঝ ঐ চাষীর অবস্থা কি। তোমার মত ভক্ত ঐ সামান্য তেলের জন্য একবারও আমার নাম করতে পার নি, আর ঐ গরীব চাষী সারাদিন খেটে সংসার মাথায় করে রেখেছে। তার মধ্যেও সে দুবার আমাকে ডাকে, আমার নাম করে, কোনদিন ভোলে না। তা দিনে বা রাতে তার যত কঠিন কাজই থাকুক না কেন। এখন তুমিই বল, কে বড় ভক্ত।'

নারদের তো মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। ভগবান আজ তার অহঙ্কার ভেঙ্গে দিয়েছেন।

[অহঙ্কার করা উচিত নয়। ভগবান অহঙ্কার খর্ব করে দেন।]



।। এগিয়ে যাওয়া ।।

বন থেকে কাঠ কেটে এনে হাটে বিক্রি করে এক কাঠুরে।

একদিন সে গেছে বনে কাঠ কাটতে। হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দেখা।

সন্ন্যাসীকে সে ভক্তিভরে প্রণাম করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে বলল, 'প্রভু দয়া করুন।' সন্ন্যাসী তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বৎস, এগিয়ে যাও।'

বলেই চলে গেলেন তিনি।

সাধুর কথাটার মানে তখন ঠিক বুঝতে পারল না কাঠুরে। তাই অন্যান্য দিনের মতন সে ওখানের গাছ থেকে কাঠ কেটে বাড়ি নিয়ে এল।

তবে, সাধুর কথাটা তার মনে ছিল। তাই বাড়িতে এসে সে ভাবতে লাগল, কেন সাধু তাকে এগিয়ে যেতে বললেন।

পরদিন বনে গিয়ে তার মনে হল, দেখি না সাধুর কথামত একটু এগিয়ে।

সেদিন বনের মধ্যে আরো খানিকটা এগিয়ে এসে সে অবাক হয়ে দেখল, একি! চারদিকে শুধু চন্দন গাছ! এখানে সে কোনদিন আসেনি। অথচ কতদিন ধরে এই বনে সে কাঠ কাটছে।

সেদিন সে শুধু চন্দন কাঠই কেটে নিয়ে এল।

শুধু তাই নয়, পর পর কদিন কাঠুরে কাঠ কাটতে গেল ঐ একই জায়গায়। বিস্তর চন্দন কাঠ জমা করল সে। তারপর একদিন সেই কাঠ বিক্রি করে অনেক টাকা রোজগার হল তার।

এরপর হঠাৎ একদিন কাঠুরের মনে পড়ল সাধুর কথা। তিনি বলেছিলেন, এগিয়ে যাও। তাহলে চন্দন বনেই বা থেমে থাকি কেন? আরও এগিয়ে দেখলে তো হয়।

সেদিন সে বনের মধ্যে আরো এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখে, আজব ব্যাপার—এক রূপোর খনি। অঢেল রূপো ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

এবার ওখান থেকে সে শুধু রূপোই আনতে লাগল। কদিন রূপো বিক্রি করে অনেক রোজগার হল তার।

এমনিভাবে আরো কিছুদিন গেল।

তখন একদিন তার মনে হল, সাধুর কথামত আরো এগিয়ে গেলে তো হয়!

সেদিন রূপোর খনি ছাড়িয়ে বনের আরও গভীরে ঢুকল সে। এসে দেখে, রূপো নয়, সোনা। সোনার খনি, চারদিকে কেবল সোনা আর সোনা।

কাঠুরে ওখান থেকে অনেক সোনা বাড়ি বয়ে নিয়ে গেল কয়েকদিন ধরে। সেই সোনা বিক্রি করে সে বেশ বড়লোক হয়ে উঠল।

এভাবে কদিন গেল।

আরো কদিন পর কাঠুরের মনে পড়ে গেল সাধুর কথা—এগিয়ে যাও। অমনি তার মনে হল, এই পর্যন্তই বা থেমে থাকি কেন, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি, ব্যাপারটা কি।

পরের দিন সে সোনার খনি পার হয়ে আরও এগিয়ে গেল। এবার সে এসে দেখে যেন স্বপ্নের জগৎ। চারদিকে শুধু হীরে-মাণিক ছড়ানো। মানুষের কাছে যা সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু।

সেই কাঠুরে হীরে-মাণিকের মালিক। এখন আর তাকে পায় কে। সে জীবনে পেয়ে গেছে সবচেয়ে দামী বস্তুর সন্ধান। সাধুর কথামত এগিয়ে যেতে যেতে সে পৌঁছে গেছে তার জীবনের চরম লক্ষ্যে।

[ভগবানকে পেতে হলে শুধু সাধনা করতে হয়। সাধনা করে যত এগিয়ে যাওয়া যায় তত দেখা যায় নতুন আলো পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে অবিরাম এগিয়ে গেলে একদিন তাঁকে পাওয়া যাবেই।]



॥ ব্রহ্মাণ্ড ঘোরা ॥

কার্তিক আর গণেশ হলেন দু ভাই, তাঁদের মা হলেন পার্বতী। দু ভাই একদিন রয়েছেন মায়ের কাছে। পার্বতী বসে আছেন, তাঁর গলায় রত্নহার। সেই মালার মণি-মাণিক্যের ছটায় চারদিক ঝলমল করছে।

দুজনেরই বড় লোভ ঐ হারের দিকে। দুজনেই আবদার ধরল মায়ের কাছে, ঐ হার তাদের চাই। প্রায় ঝগড়া বাঁধে, এমন অবস্থা। পার্বতী ঝগড়া থামাতে দু ভাইকে বললেন—তোমাদের মধ্যে যে আগে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসতে পারবে তাকে এই হার দেব।

কার্তিকের বাহন ময়ূর। মায়ের কথা শুনেই তিনি ময়ূরের পিঠে চেপে বেরোলেন। উড়ে চললেন আকাশপথে। গোটা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা তো সহজ কাজ নয়। হাজার হাজার মাইলের পথ।

গণেশ কিন্তু বড় মাতৃভক্ত। তাঁর কাছে মা-ই সব। ব্রহ্মাণ্ড তো মায়ের মধ্যে। মাকে প্রদক্ষিণ করলেই ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করা হবে। গণেশ তাই পার্বতীকেই প্রদক্ষিণ করে এলেন। তারপর তাঁকে প্রণাম করে সামনে এসে বললেন—মা, আমার ব্রহ্মাণ্ড ঘোরা হয়ে গেছে।

মা বুঝলেন সবই, তবুও না বোঝার ভান করে বললেন—কি করে?

গণেশ হাসলেন—তুমিই তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মা। তুমিই জগৎমাতা, বসুন্ধরা, পৃথিবী। তোমাকে ঘুরে এসেছি মানেই তো আমার পৃথিবী ঘোরা হয়ে গেছে।

পার্বতী ছেলের কথা শুনে খুব খুশি হলেন, বুক তাঁর ভরে গেল ছেলের মাতৃভক্তি দেখে। তাই তাঁকে আশীর্বাদ করে হারটি ঐ ছেলেরই গলায় পরিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলেন কার্তিক। এসে দেখেন, গণেশের গলায় সেই মণিহার দুলছে। অবাক হলেন দারুণ। বুঝতেই পারেন না, বড় ভাই গণেশ কি করে তাঁর আগেই কাজটা সেরে এল।

পার্বতীই তাঁকে বললেন সব কথা। শুনে কার্তিক লজ্জায় মাথা নিচু করলেন।

[পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে বড় কেউ নেই।]



।। বহুরূপী ।।

একটা গাছে একটা গিরগিটি থাকত। কজন লোক তাকে দেখেছিল। একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা ভাবে।

সেই গিরগিটিটাকে নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল।

একজন বলল, 'দূরে ঐ গাছে একটা গিরগিটি থাকে, কি সুন্দর লাল রং তার! তোমরা দেখেছ?'

আর একজন বলল, 'আমি দেখেছি ঐ গিরগিটিটাকে। ওটার রং লাল নয়, সবুজ। লাল বললেই তো হবে না। নিজের চোখে দেখলুম সবুজ।'

অমনি আর একজন বলে উঠল, 'কি যে বলছ তোমরা! গিরগিটিটার রং লালও নয়, সবুজও নয়, হলদে রঙের। এই তো আমি এখানে আসবার সময় দেখলুম গাছের ওপর গিরগিটিটা রয়েছে, একবারে হলুদ। যাই বল ভাই রংটা কিন্তু দারুণ খাসা। একেবারে পাকা সোনার মত।'

আর একজন অমনি তেড়ে উঠল, 'কি বাজে বকছ তোমরা? গিরগিটিটার রং তো একেবারে নীল। আমার তো ভাই বেশ মজা লাগছে তোমাদের সব কথাবার্তা শুনে। নিজের চোখে যা দেখলুম তা অবিশ্বাস করি কি করে। গিরগিটিটার রং নীল।'

আর একটি লোক বলল, 'তোমাদের কারুর কথাই ঠিক নয়। আমি খুব ভালো করে দেখেছি, ওটার রং বেগুনি। আমিই বা আমার নিজের দেখা জিনিসকে অবিশ্বাস করি কি ভাবে। আমি দুঃখিত, তোমাদের কারো সাথে একমত হতে পারলাম না। গিরগিটিটার রং বেগুনি।'

এভাবে তর্ক করতে করতে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। সবাই বলে, 'আমার কথাই ঠিক।' কারো কথাই কেউ ভাল করে শুনছে না। তাই তাদের কোন কথাই আর বোঝা যাচ্ছে না। চেঁচামেচির ভেতরে

এক একটা কথা হঠাৎ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তা হল, লাল। নীল। হলুদ। সবুজ। বেগুনি।

ঝগড়া আর শেষ হতে চায় না। তখন একজন বলল, 'বাপু হে, অত চেঁচামেচির দরকার কি। এই গাছের নিচে একটা লোক থাকে। সে তো রোজই গিরগিটিটাকে দেখছে। তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক, ওটার আসল রং কি।'

তার কথায় সকলেই রাজি হল। সবাই মিলে গাছতলায় এসে দেখে, সেই লোকটি ওখানে বসে আছে।

একজন এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, গিরগিটিটার রং কি। আপনাকেই সাক্ষী মানছি আমরা।'

লোকটি বলল, 'তাহলে শোন। আমি এই গাছতলাতেই থাকি। বহুবার দেখছি তাকে, ভালো করে জানি। তাই বলতে পারি, তোমাদের কারো কথাই ভুল নয়, তোমরা প্রত্যেকে ঠিক ঠিক দেখেছ। গিরগিটিটার রং কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো নীল, কখনো হলুদ, কখনো বেগুনি হয়। আবার কখনো দেখি, তার কোন রঙই নেই। আসলে গিরগিটিটা হল বহুরূপী।'

[ভক্তি নিয়ে, মন দিয়ে যে যেভাবে ঈশ্বরকে কল্পনা করে, ঈশ্বরও তাকে ঠিক সেইভাবেই দেখা দেন।]



॥ বিপদত্রাতা হরি ॥

বৈকুণ্ঠে বাস করেন লক্ষ্মী আর নারায়ণ। ভক্তদের দিকে তাঁদের সদাসর্বদা নজর।

সেদিন নারায়ণের পদসেবা করছিলেন লক্ষ্মী। হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন নারায়ণ। যেন এখুনি কোথাও যেতে হবে।

লক্ষ্মী একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন—কি হল, কোথাও যাবেন নাকি প্রভু?

নারায়ণ বললেন—একবার মর্ত্যে যাব।

—হঠাৎ মর্ত্যে যাবেন যে?

—আমার এক ভক্ত খুব বিপদে পড়েছে, তাকে বাঁচাতে যাব।

এই বলে নারারণ চলে গেলেন।

কিন্তু ফিরে এলেন একটু পরেই। মুখ দেখে বোঝা গেল, বেশ হতাশ হয়েছেন। যে উৎসাহ নিয়ে রওনা হয়েছিলেন, তার কিছুই নেই।

লক্ষ্মী তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি ঠাকুর, এরই মধ্যে ফিরে এলেন যে? সেই ভক্তের কি হল?

এবার নারায়ণ হেসে ফেললেন। বললেন—ভক্তিতে গদগদ হয়ে আমার এক ভক্ত পথ চলছিল। কোন দিকে তাকায় নি, ছিল একেবারে অন্যমনস্ক। ধোপারা কাপড় শুকোতে দিয়েছিল মাঠের ওপর। ভক্ত তারই ওপর দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে। ধোপারা দেখতে পেয়ে লাঠি দিয়ে মারতে আসছিল তাকে। বেচারীকে তাই রক্ষা করতে গিয়েছিলুম।

লক্ষ্মী বললেন—তা ভক্তকে বাঁচিয়ে এলেন বুঝি?

নারায়ণ আবার হাসলেন—না, তার আর দরকার বোধ করলুম না। গিয়ে দেখি ভক্ত নিজেই ধোপাদের মারবার জন্য ইঁট তুলেছে!

[যে মানুষ ভগবানকে সর্বস্ব অর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁকেই রক্ষা করেন। নিজেই সব কিছু করবে বলে যে ঠিক করে, ভগবান তাকে সাহায্য করেন না।]



।। সংসারেও ঈশ্বর আছেন ।।

এ গল্প রামায়ণের। রামকে নিয়ে।

রামচন্দ্র তখন একটু বড় হয়েছেন। মুনি-ঋষিদের কাছে জ্ঞান লাভ করে বেশ জ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। মনে মনে তাঁর এই জ্ঞানের পিপাসা ক্রমশ বেড়েই চলছে। যতই তিনি নতুন নতুন জিনিস জানেন বা শিক্ষা লাভ করেন ততই তাঁর ঈশ্বরকে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে।

ভগবানকে জানার আগ্রহ বেড়েছে রামচন্দ্রের। মুনিঋষিদের কাছে শুনেছেন তাঁর অনুপম রূপলাবণ্যের কথা। তিনি জেনেছেন, ঈশ্বর করুণাময় ও দয়াময়। তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর সকল জীবের প্রতি রয়েছে তাঁর অসীম করুণা। অথচ ঈশ্বর নিজে অতুলনীয় শক্তির অধিকারী, অমিত ক্ষমতা তাঁর।

সংসার রামচন্দ্রের কাছে কোন আকর্ষণীয় স্থান নয়। তাঁর ভাল লাগে না এই পারিবারিক মোহ বন্ধন। একা থাকতে চান তিনি। একটু একা! একা!

একদিন তিনি হাজির হলেন দশরথের কাছে। বললেন, 'বাবা, এসব আমার ভালো লাগছে না। আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব।'

ছেলের মুখে এমন কথা শুনে বেশ ভয় পেলেন রাজা দশরথ। জিজ্ঞেস করলেন, 'সংসার ছেড়ে যেতে চাইছ কেন?'

রাম বললেন, 'ভগবানকে পাব বলে।'

দশরথ নিজে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন না। বশিষ্ঠকে সব কথা জানিয়ে বললেন, 'আপনি ওঁকে বুঝিয়ে বলুন।'

এই বশিষ্ঠ ছিলেন রামচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতাদের শিক্ষাগুরু।

বশিষ্ঠ অনেক ভাবলেন। রামের মত বুদ্ধিমান ছেলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁকে ফেরানো তো সহজ ব্যাপার নয়।

তবু বশিষ্ঠ গেলেন তাঁর কাছে। দেখলেন, রামের মনে বৈরাগ্য জেগেছে। সংসারে মন নেই তাঁর।

বশিষ্ঠ তখন রামকে বললেন, 'রাম, তুমি শুধু আমার একটা কথার জবাব দাও। তারপর তোমার ইচ্ছে হলে সংসার ছেড়ে দিও।'

রাম বশিষ্ঠকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাই গুরুদেবকে প্রণাম করে বললেন, 'বলুন।'

বশিষ্ঠ বললেন, 'আচ্ছা রাম, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া ?'

রাম চুপ করে রইলেন।

বশিষ্ঠ আবার বললেন, 'ভগবান যে পৃথিবীর সব কিছু তৈরি করেছেন, এ কথা তো তুমি মানো। তাহলে সংসারও তো তাঁর তৈরি। সংসার থেকে ঈশ্বরকে বাদ দেবে কেমন করে ?'

রাম বুঝলেন বশিষ্ঠদেবের কথাই ঠিক। চুপ থেকে তিনি তাঁর কথা মেনে নিলেন।

[ভগবানের আরাধনা করতে হলে সংসার ছেড়ে বনে যেতে হবে, এ ধারণা ভুল। সংসারে থেকেই তাঁর আরাধনা করা যায়।]





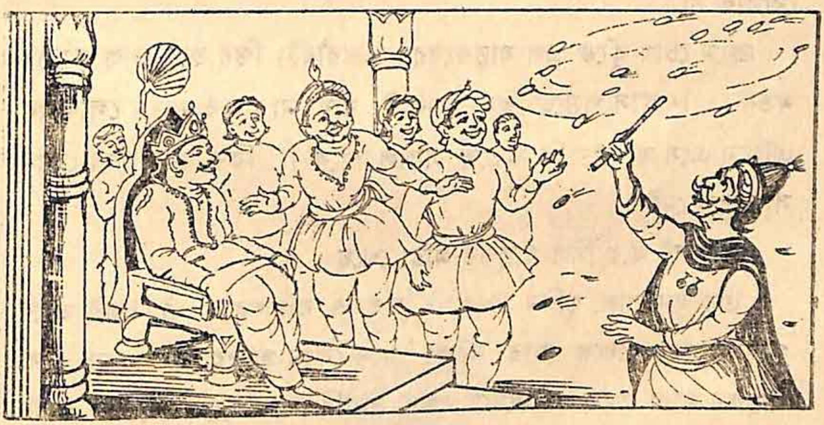
॥ যে ভেলকির শেষ নেই ॥

এক ছিল যাদুকর। সে ছিল ভেলকির রাজা।

যে কোন লোকের চোখের সামনে তার ইচ্ছামত জিনিসকে নিয়ে আসতে পারত, আবার শূন্য থেকেও নিয়ে আসতে পারত তার ইচ্ছামত জিনিস।

যাদুকরের ভেলকি দেখে সবাই অবাক হতো।

সে কিন্তু নির্বিকার, হাতে একটা ছোট লাঠি নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে



ঘুরিয়ে বলত, 'লাগ্ ভেলকি লাগ্', আর এক একটা জিনিসের নাম করে যেই চাইত, অমনি তা এসে যেত।

লোকটার খেলা দেখাবার পদ্ধতির ছিল অদ্ভুত। একজনের সামনে এসে লাঠি ঘুরিয়ে বলত, 'লাগ্ ভেলকি লাগ্, রূপেয়া দেও!'

সে কিছু বলার আগেই তার টুপিটা খুলে নিয়ে টুপির ভেতর থেকে টাকা বের করে দিত।

কারুর সামনে 'লাগ্ ভেলকি লাগ্' বলে লাঠিটা ঘুরিয়ে তার পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা ডিম বের করে আনত। লোকটা

তো একেবারে বোকা বনে যেত। আর তাকে বোকা বনতে দেখে সবাই হেসে উঠত।

এমনিভাবে চলল অনেক দিন।

যাদুকরের খেলার কথা একদিন শুনলেন রাজা। তিনি ডাকলেন রাজসভায় এসে তাকে খেলা দেখাতে।

যাদুকর এল রাজার কাছে। তাঁর সামনে লাঠিটা ঘুরিয়ে বলতে লাগল, 'লাগ্ ভেলকি লাগ্। রাজা, রূপেয়া দেও। কাপড়া দেও…'

অমনি উড়ে এসে টাকা পড়তে লাগল। রঙিন কাপড় পড়তে লাগল।

এদিকে খেলা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ কিভাবে যেন যাদুকরের জিভটা আটকে গেল। গলার কাছে জিভটা সেই যে উলটে গেল, সোজা আর হয় না। মুখ তার বন্ধ হয়ে গেল, আর কোন কথাই বেরোল না।

ক্রমে চোখ বুঁজে এল যাদুকরের। শরীরটা স্থির হয়ে গেল কাঠের মতন। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝাই যায় না। রাজার লোকজন এগিয়ে এসে ডাকাডাকি করতে লাগল তাকে। কিন্তু তার আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

সকলেই ধরে নিল যাদুকর মারা গেছে।

একদিন গেল, দুদিন গেল। তখনও যাদুকরকে ঐ একই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে আর কারুর মনে কোন সন্দেহ রইল না যে, যাদুকর মারা গেছে। মরেছে যখন, সমাধি দিতে হয়। ইঁটের একটা কবর তৈরি করে পুঁতে দেওয়া হল তাকে।

তারপর কত কাল কেটে গেল। বছরের পর বছর। যাদুকরের সেদিনের খেলা যারা দেখেছিল একে একে তারা সবাই মারা গেল। নতুন নতুন লোক এসে বাস করতে লাগল সেখানে। তারা কেউ ঐ কবরের কথা জানে না।

কবরটা যে অবহেলায় অনাদরে ভেঙ্গে পড়ল কবে, তাও কেউ জানে না। একদিন একজন ইঁটগুলো সরাতে গিয়ে দেখল, কে একজন সমাধিস্থ রয়েছে।

খবর পেয়ে অনেক লোক সেখানে জড়ো হল। তারা তাকে

ঠেলাঠেলি করে বুঝল, লোকটা মরে নি। নিশ্চয়ই কোন সাধু সমাধিতে রয়েছেন।

সবাই মিলে তখন ধরাধরি করে যাদুকরকে বের করে আনল সেখান থেকে। আনতে গিয়ে নড়াচড়া হল, আর তাতেই তার ওলটানো জিভ সোজা হয়ে গেল। তার জ্ঞান ফিরল। কথা ফুটল মুখে।

অমনি সে চেঁচিয়ে উঠল, 'লাগ্, ভেলকি লাগ্। রাজা রূপেয়া দেও। কাপড়া দেও......'

[মানুষের মনের কামনা-বাসনার চট করে মৃত্যু হয় না।]



।। রতনে রতন চেনে ।।

এক ভদ্রলোকের একটা হীরে ছিল। তাঁর খুব ইচ্ছে হল, হীরেটার দাম কত, তা যাচাই করে দেখবেন। তাই তাঁর চাকরকে হীরেটা দিয়ে বললেন, 'এটা বাজারে নিয়ে গিয়ে দরটা যাচাই করে আয়। কোন্ দোকানী কি দাম দেয় দেখি।'

—যে আজ্ঞে। চাকর তখুনি মাথা নাড়ে।

—আর শোন্। আগে যাবি বেগুনওয়ালার কাছে। সে কত দাম দেয় দেখ, তারপর এসে আমায় বলবি।

চাকর গেল বাজারে, বেগুনওয়ালার কাছে। গিয়ে সোজা বলল—এই হীরেটার জন্য কি দাম দেবে বল।

বেগুনওয়ালা হীরেটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর ভেবেচিন্তে বলল, 'আমি এটা টাকা দিয়ে কিনব না। এই পাথরটার বদলে ন সের বেগুন দিতে পারি।'

চাকর বলল, 'ন সের ? আরেকটু বাড়াও, দশ সের করো।'

বেগুনওয়ালা মাথা নাড়ল, 'উহু' বাজারে এর যা দর তার চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। আবার বাড়াব কি ? রাজি থাক তো দাও।'

চাকর ফিরে এল মনিবের কাছে। বলল, 'বেগুনওয়ালা ন সের বেগুন দিতে চাইছে, তার বেশি কিছুতেই দেবে না।'

বাবু হেসে বললেন, 'এবার তাহলে কাপড়ওয়ালার কাছে যা। সে তো বেগুনওয়ালার চেয়ে বড় ব্যাপারী। দেখ তো, সে কি দাম দেয়।'

চাকর হীরেটা নিয়ে কাপড়ের দোকানে এল। ওটা দোকানীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এর দাম কত দিতে পারেন ?'

কাপড়ওয়ালা হীরেটা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলল, 'এমনিতে দেখছি জিনিসটা মন্দ নয়। এ দিয়ে গয়না তৈরি করা যায়। আমি এর দাম ন শ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।'

চাকর একটু দরদস্তুর করার চেষ্টা করল, 'আর একটু বাড়াতে পারেন না ? এই ধরুন, নশোর বদলে হাজারটা টাকা ?'

কাপড়ওয়ালা মাথা নাড়ল, 'না রে ভাই, আমি এর দাম অনেক বেশিই দিয়েছি। বাজার যাচাই করলেই তা দেখতে পাবে। আমি নশোর ওপরে একটি টাকাও দেব না।'

চাকর ফিরে এসে মনিবকে সব কথা জানাল।

মনিব সব শুনে হেসে বললেন, 'এবার জহুরীর কাছে যা। সে কি দাম দেয় দেখি।'

চাকর এবার জহুরীর দোকানে এল। হীরেটা দেখিয়ে বলল, 'এর জন্য কত দাম দিতে পারেন ?"

জহুরী হীরেটা হাতে নিয়ে এক নজর দেখেই বলল, 'এটা আমার কাছে থাক ভাই। তোমায় আমি এক লাখ টাকা দেব !'

[উপযুক্ত লোকের কাছে না গেলে কোন জিনিসের সঠিক দাম পাওয়া যায় না।]





॥ মোহভঙ্গ ॥

গাঁয়ের এক চাষীকে গ্রামের সবাই খুব মান্য করে আর ভালবাসে। চাষী এমনিতে খুব ভালো মানুষ। সে পরের জিনিসে লোভ করে না, কাউকে হিংসে করে না, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে চাষের কাজ করার পর যেটুকু সময় পায় সেটুকু সময় সৎ আচরণ করে।

চাষীর জমি খুব কম। ফসল হয় সামান্যই। তবে চাষের কাজটা সে নিজেই করে বলে কাউকে ভাগ দিতে হয় না। তার ওপরে তার সংসারও ছোট—বউ আর একটি ছেলে। যা ফসল হয় তাতে তাদের কোন রকমে দিন চলে যায়।

চাষীর ছেলেটির নাম হারু। একমাত্র ছেলে বলে তার আদর খুব। চাষী আর তার বউ দুজনেরই চোখের মণি সে।

সেদিন দুপুরবেলা। চাষী তখন জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছিল। হঠাৎ তার পাশের বাড়ি থেকে একজন এল ছুটতে ছুটতে। বলল, 'শিগগির এসো, হারুর কলেরা হয়েছে।'

চাষী সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল কবিরাজের বাড়ি। তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

কবরেজ মশাই হারুকে ওষুধ দিলেন। তারপর তাকে যা যা করতে হবে বললেন। চাষী তাঁর সব কথা শুনল, কিন্তু হারুকে বাঁচানো গেল না। সে মারা গেল সন্ধ্যের পর।

ছেলের শোকে চাষী-বউ পাগলের মত হয়ে গেল। পাড়াপ্রতিবেশী সবাই সান্ত্বনা দিতে লাগল তাকে।

কিন্তু হারুর বাবাকে দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। লোকটা এত ভালবাসত তার ছেলেকে, অথচ ছেলের শোকে একবারও কাঁদল না!

পরদিন চাষী আগের মতই চাষ করতে মাঠে গেল। সারা দিন ধরে জমি চাষ করল। তারপর বিকেলবেলা ঘরে ফিরে গেল।

তার ঘরে তখনও শোকের ছায়া। বিছানায় শুয়ে তখনও চাষীর বউ কাঁদছে।

স্বামীকে দেখে তার শোক আরও উথলে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই গো? অমন সুন্দর ছেলেটা চলে গেল, তুমি তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না?'

শুনে চাষী চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তাহলে তোমায় বলি, কেন আমার কান্না পায় নি। কাল রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখলুম, আমি রাজা হয়ে গেছি, প্রকাণ্ড রাজবাড়িতে রয়েছি। আমার আটটা ছেলে, খুব ধূমধামে আমার দিন কাটছে। দলে দলে প্রজা এসে আমার শুভকামনা করছে, আর বলছে, 'জয় মহারাজের জয়!'

সে এক দারুণ সুখের জীবন। তারপর এক সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন আমি ঠিক করতে পারছি না, আমার সেই আট ছেলের জন্য কাঁদব, না, তোমার এক ছেলের জন্য কাঁদব?'

চাষী-বউয়ের মুখে আর কথা জোগাল না। এমন ধরনের কথা সে জীবনে শোনেনি। মনে মনে ভাবল, লোকটার মাথাটা ঠিক আছে তো, না, ছেলের শোকে পাগল হয়ে গেছে।

[এই সংসার মায়া বা স্বপ্নমাত্র। এখানে কিছুই চিরকাল থাকবে না। অতএব কোন কিছুর জন্যই শোক করে কিছু লাভ নেই।]



।। সার্থক জনম ।।

এক গৃহস্থের একটি চাকর ছিল। সে যেমন ফাঁকিবাজ, তেমনি কুঁড়ে। কোন কাজে তার গা নেই। তাই মনিবের সঙ্গে তার সব সময় খিটিমিটি বাঁধে।

একদিন চাকরের মনে হল, দূর ছাই! এসব কাজকম্ম আর ভালো লাগে না। তার চেয়ে পালিয়ে যাই কোথাও।

মনিবকে সে কথা জানালে সে হয়ত তাকে যেতেই দেবে না। এই ভেবে চাকর গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটা মাটির কলসী নিয়ে বেরোল, যেন জল আনতে যাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করল, সুযোগমত কলসীটাকে জলে ডুবিয়ে দেবে।

এই ভেবে সে কলসী হাতে নিয়ে চলেছে, এমন সময় তার কানে এল, 'ওহে, শুনছ!'

চাকর প্রথমটায় একটু অবাক হয়েছিল। আশেপাশে তো লোক নেই কোথাও, তাহলে কে কথা বলছে তার সঙ্গে? অবাক হয়ে দেখল, কলসী কথা বলছে তার সঙ্গে।

মন দিয়ে সে শুনল, কলসী বলছে, 'আমি কলসী কথা বলছি, শোন। তুমি আমায় জলে ডুবিয়ে দিতে চাও, কিন্তু একবার ভেবে দেখ তো আমার কথাটা। আমি সেই কত দূরে মাটি হয়ে ছিলুম। মজুররা কোদাল দিয়ে খুঁড়ে আমায় তুলেছে, তারপর ঝুড়িতে বয়ে এনেছে, জলে ভিজিয়ে নরম করেছে। আমার মধ্যে যত পাথরের টুকরো আর কাঁকর ছিল, সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। কুমোর তারপর আমায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে চাকে দিয়েছে। চাকের পাকে পাকে আমায় কত ঘুরিয়েছে। কুমোরের হাতে আর ছাঁচে ধীরে ধীরে কলসীর রূপ পেয়েছি আমি। তখনও তো আমি কাঁচা মাটি। কুমোর সেই কাঁচা কলসীকে পুড়িয়েছে রোদে আর আগুনে। এত কাণ্ডের পর আমি কাজের কলসী হতে পেরেছি। এখন দেখ, আমার কত যত্ন।

কেউ আমায় মাথায় করে নিয়ে যায়, কেউ কাঁধে করে, কেউ কাঁকালে। আগে ছিলুম সামান্য মাটি, আর এখন আমার জন্য সবাই তেষ্টার জল রাখছে। কত লোকের প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমার জন্ম সার্থক : আর তুমি কিনা জলে ডুবিয়ে দিয়ে আমাকে এইভাবে নষ্ট করে ফেলতে চাইছ ?'

সব শুনে চাকরের মনে হল, কলসীটা তাহলে নষ্ট করা উচিত নয়। সে ওটা আর নষ্ট করল না।

[সহজে বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে দুঃখকষ্টের অনেক ধাপ পেরোতে হয়।]



রা—৮



।। মায়া কাটানো ।।

পাহাড়ের ওপর একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকত একটা লোক। একলা মানুষ, সম্বল বলতে ঐ কুঁড়ে ঘরখানাই। ঘরটা সে তৈরি করেছিল নিজের হাতে, তাই ওটার ওপর বড় মায়া।

এভাবেই দিন যাচ্ছিল।

একদিন সেই পাহাড়ে ভীষণ ঝড় উঠল। যেমন ঝড়ের গর্জন, তেমনি হাওয়ার দাপট। গাছপালা সব নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল। বাদ গেল না সেই কুঁড়েটিও। দমকা বাতাসে সেটি ভেঙে পড়ে, এমন অবস্থা।

লোকটির তো তাই দেখে ভীষণ ভাবনা হল। এমন দারুণ ঝড়। এর ভেতর থেকে সে তার সাধের কুঁড়েঘরকে বাঁচাবে কি করে?

কোন উপায় না দেখে সে ঝড়ের দেবতাকেই ডাকতে শুরু করল, 'হে পবনদেব, তুমি আমার কুঁড়েঘরটিকে রক্ষা কর। এটি ছাড়া আমার আর দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

পবনদেবতা কিন্তু বেচারার কথা কানে নিলেন না। বরং ঝড়ের গতি যেন আরও বেড়ে উঠল। মড়মড় করছে কুঁড়েঘর, এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে!

তখন লোকটির মনে পড়ল হনুমান হল পবনদেবতার পুত্র। অমনি সে হনুমানকে ডাকতে লাগল, 'দোহাই বাবা হনুমানজী! এ ঘর লক্ষ্মণের, দেখো, যেন ভেঙ্গে না পড়ে।' জয় বাবা পবননন্দন, রক্ষা করো।

কিন্তু কিছুই হল না। বরং ঝড়ের দাপটে ঘরটা পড়ে যায় যায় অবস্থা। আর বুঝি বাঁচানো গেল না।

লোকটি তখন খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'দোহাই বাবা হনুমানজী! এ হল রামের ঘর। দেখো, এ ঘর যেন ভেঙ্গে না পড়ে।' ছেলের

অন পেল কিনা বোঝা না গেলেও বাপের যে মন পেল না তা নিশ্চিত করে বোঝা গেল।

কেননা ঝড়ের শব্দে লোকটার গলা কোথায় ভেসে গেল। আর হুড়মুড় করে তক্ষুনি ভেঙ্গে পড়ল কুঁড়েঘরটা।

স্তব, স্তুতি. নাম, ডাক, সব ঘরের মধ্যে বসেই করছিল।

তাই সে ঘরের মধ্যে ছিল। ঘর ভেঙ্গে পড়ার আগের মুহূর্তে বাইরে এল। নইলে ঘরের সঙ্গে তার প্রাণটাও যেত।

হায়! হায়! তার সব গেল। এতদিনের এত সাধের ধন গেল ভেঙ্গে। এত মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরকে ডেকেও রক্ষা করতে পারল না। আশ্চর্য, লোকটি এসব কথা একবারও ভাবল না ভাবল। না তার কি হলো।

অমন সাধের কুঁড়েঘরটা ভেঙ্গে যেতে লোকটার সব মায়া কেটে গেল। 'চুলোয় যাক্ ঘর' বলে যেদিকে দু চোখ যায়, সেদিকেই এগোতে লাগল।

[সংসারের মায়া কাটাতে সময় লাগে। কিন্তু একবার মোহ ভঙ্গ হলে সংসার ছাড়তে মানুষ আর ইতস্তত করে না।]





॥ দেবতার ঠাঁই ॥

ছেলেটিকে গাঁয়ের সবাই ডাকত 'পদো' বলে। আসল নাম তার 'পদ্মলোচন'।

পদো ছিল একটু পাগলাটে ধরনের। কাজকর্ম কিছুই করে না। টো টো করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। কিন্তু ভাবসাব এমন করে, যেন মনে হয় কত কাজের লোক। সবাই তাই এ নিয়ে খুব হাসিঠাট্টা করে। কিন্তু পদো কাউকে কিছু বলে না, কারুর ওপর রাগ করে না।

সেই গাঁয়ে অনেক দিনের পুরনো একটা পোড়ো মন্দির আছে। অনেক কাল সেই মন্দির মেরামত হয় নি, কোন দেবতার মূর্তিও আর তার মধ্যে নেই। পাঁচিলে ফাটল ধরেছে, শিকড় গজিয়েছে অশ্বত্থ গাছের। দেওয়ালে শেওলা ধরেছে। চামচিকের দল বাসা বেঁধেছে মন্দিরের মধ্যে। গোটা মেঝেটা ধুলো আর নোংরায় ভরা।

গাঁয়ের কেউ মন্দিরের ধারেকাছে যায় না।

সেদিন সন্ধ্যে হয় হয়। হঠাৎ সকলের কানে এল শাঁখের আওয়াজ। ভালো করে শুনে তাদের মনে হল, ঐ পোড়ো মন্দিরের মধ্যেই শাঁখ বাজছে।

লোকে তখন বলাবলি করতে লাগল, 'মন্দিরে ঠাকুর এসেছে নাকি? সন্ধ্যে আরতি হচ্ছে!'

এই ভেবে গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাই দৌড়ে এল সেখানে। ঠাকুর দেখবে,আরতি দেখবে বলে। হুড়মুড়িয়ে সবাই ঢুকল মন্দিরের ভেতরে।

ও মা! এ কি কাণ্ড!

পুজো-আচ্চা কিছুই নয়, একা মন্দিরের ভেতরে দাঁড়িয়ে পদো শাঁখ বাজাচ্ছে। কোথায় ঠাকুর? চারদিক তেমনি ধুলোয় ভরা। চামচিকের দল উড়ে বেড়াচ্ছে ফর্ ফর্ শব্দ তুলে।

তারই মধ্যে একা দাঁড়িয়ে পদো গম্ভীরভাবে শাঁখ বাজিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন মন্দিরে আবার দেবতা এসেছেন।

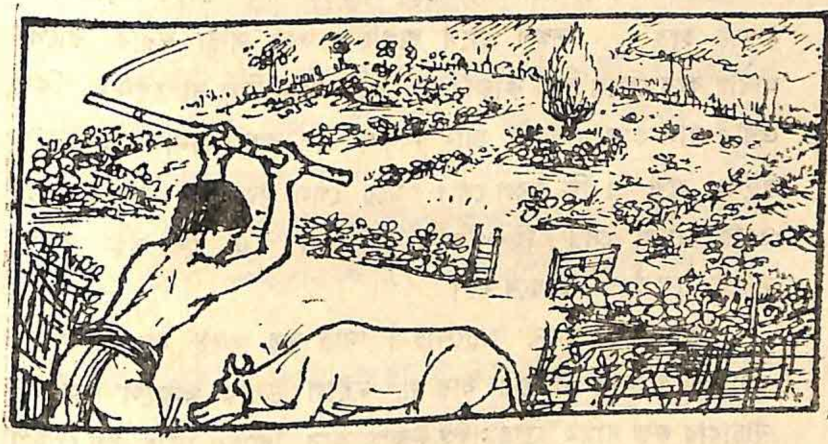
[সাজানো মন্দির না থাকলে পুজো হয় না, এ ধারণা ভুল। যে কোন জায়গাকেই ইচ্ছে করলে মন্দির বানানো যায়।]



॥ পাপের ভাগ ॥

এক বামুন অনেক যত্ন করে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করেছিল। কিছু এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে, কিছু চারা নিজে কিনে এনে বসিয়েছিল বাগানে। নানা রকমের ফলে-ফুলে তাই ভরে উঠেছিল বাগানটা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত।

বামুনেরও যেন প্রাণ ঐ বাগান। নিজ হাতে করেছে বাগানের সব কিছু।



সেদিন হল কি, কার একটা গরু ঢুকে পড়ল বাগানে। গরুর যা স্বভাব, সে কি করে বুঝবে বামুনের কত সাধের বাগান এটা, দিব্যি ভালো ভালো গাছগুলোর পাতা মুড়িয়ে খেতে শুরু করল। বিশেষ করে সুন্দর সুন্দর ফুল গাছগুলো।

বামুন তখন ঘরের ভেতর বসে কি যেন একটা কাজ করছিল। ঘুরতে ঘুরতে অনেকগুলো গাছের বারোটা বাজিয়ে যখন এল তার ঘরের সামনে, তখন গরুর চলাফেরার শব্দ পেয়ে লাফিয়ে উঠল বামুন। এক লাফে ঘরের বাইরে এসে দেখে, ধারণা ঠিক, গরুই ঢুকেছে—দিব্যি ঘাড় তুলিয়ে তার সাধের গাছগুলোকে আরাম করে মুড়িয়ে খাচ্ছে।

বামুন তো রেগে টং। তবে রে হতচ্ছাড়া গরু, দেখাচ্ছি মজা!

বামুন দৌড়ে ঘরে ঢুকে সবচেয়ে মোটা বাঁশের লাঠিখানা হাতে তুলে নিল। রাগে তখন ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলছে। লাঠি-হাতে এল গরুটার পেছনে। গরু তো আর জানে না, তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সাক্ষাৎ যম। দিব্যি মনের আনন্দে আর একটা চারাগাছের মাথা মুড়িয়ে খাচ্ছিল। দেখে বামুনের আর সহ্য হল হল না। দু হাতে লাঠিটা তুলে গরুটার মাথায় মারল এক ঘা।

গরু সেই প্রচণ্ড আঘাত সইতে পারল না, তখুনি পড়ে গেল মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।

লাঠির ঘা খেয়ে গরু আর নড়ে না, চড়ে না। দেখে বামুনের তো মাথায় হাত। এতক্ষণ রাগে জ্বলছিল তার সারা শরীর, রাগের মাথায় করে ফেলেছিল কাজটা। কোন জ্ঞান ছিল না তখন। কিন্তু এবার রাগ কমে যেতেই জ্ঞান ফিরল এল অনুশোচনা। হায় হায়, রাগের বশে এ কি করল সে? মরে গেল গরুটা! নিজের হাতে তাকে মারল সে। হিন্দু হয়ে গো-হত্যা! এ যে মহা পাপ! নরকেও যে তাঁর ঠাঁই হবে না!

যত ভাবে বামুন, অনুশোচনা আর ভয় ততই বাড়তে থাকে। মরা জন্তুকে আর বাঁচানো যায় না, নইলে উপায় থাকলে গরুটাকে বাঁচাবার জন্য বামুন তার সর্বস্ব উজাড় করে দিতেও বোধ হয় পেছপা হতো না।

কিন্তু তখন তো হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। বামুনের মাথায় কেবল চরকি খেতে লাগল 'পাপ' কথাটা। পাপ, পাপ আর পাপ। পাপ নাকি বাপকেও ছাড়ে না। তাহলে এখন উপায়?

সাত-পাঁচ ভাবছিল বামুন। হঠাৎ বেদান্তের একটা কথা মনে গেল তার। বেদান্তে আছে, চোখের কর্তা সূর্য, কাজের কর্তা পবন, হাতের কর্তা ইন্দ্র।

ব্যস্! শেষের এই কথাটাই বামুন বার বার মনে মনে বলতে থাকে। আমার হাতের কর্তা ইন্দ্র, তাহলে এ গোহত্যা আমি করি নি,

করেছে ইন্দ্র। ইন্দ্রের শক্তিতে আমার হাত চলেছে, তাই এ গোহত্যার জন্য দায়ী ইন্দ্র। এ পাপ আমার নয়। এ পাপ ইন্দ্রের।

মনকে খাঁটি করল বামুন। দারুণভাবে বিশ্বাস করল, ইন্দ্রই এ গোহত্যার জন্য দায়ী। ফলে গোহত্যার পাপ তার শরীরে ঢুকতে পারল না, মনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল। মন বলল—এ পাপ আমার নয়, ইন্দ্রের। যদি ধরতেই হয় তাহলে আমাকে না ধরে ইন্দ্রকে গিয়ে ধর। পাপ ফিরে গেল।

আর তখুনি ছুটল ইন্দ্রকে ধরতে।

ব্যাপার শুনে ইন্দ্র তো অবাক। পাপকে বললেন—তোমার কথা বাপু কিছুই বুঝছি না। একটু দাঁড়াও, আগে বামুনের সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি। বুঝে আসি ব্যাপারটা কি।

মানুষের রূপ ধরে ইন্দ্র তখন এলেন সেই বাগানে। দেখলেন, বামুন তখনও বসে রয়েছে বাগানে। ইন্দ্র তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাগানের ফুল-ফল-লতাপাতা দেখে খুব প্রশংসা করতে লাগল। বামুন প্রথমে চুপ করে ছিল, কিন্তু অত প্রশংসার কথা শুনে কতক্ষণ চুপ থাকবে সে? প্রশংসার জবাবে কিছু একটা বলার জন্য ছটফট করছিল সে।

বামুনের দিকে তাকিয়েই অন্তর্যামী ইন্দ্র বুঝতে পারছিলেন সব। মুখোমুখি হলেন। জিজ্ঞেস করলেন—মশাই, বলতে পারেন এ বাগান-খানা কার? এমন সুন্দর বাগান জীবনে দেখিনি।

আবার প্রশংসা। বামুন খুব খুশি। কিন্তু খুশির ভাবটাকে প্রকাশ না করে সলাজ হাসি হেসে বলল—আজ্ঞে, এটি আমার করা।

এসব গাছপালা কার? ইন্দ্র জিজ্ঞেস করেন।

বামুন এবার গদগদ হয়ে বলল—আজ্ঞে, এ বাগানের সব গাছপালা আমি পুঁতেছি। নিজে হাতে সব কিছু করেছি আমি। খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে তার জন্য।

এ সব যা কিছু দেখছেন সবই আমার হাতের। আসুন না, ভালো করে দেখুন না ঘুরে-টুরে।

ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বামুন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল বাগানখানা।

ইন্দ্র দেখতে দেখতে এমন ভাব করলেন যেন বাগানের শোভা দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেছেন। এদিকে যান, ওদিকে যান তারপর এক সময়ে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন সেখানে, যেখানে গরুটা মরে পড়ে আছে। চমকে উঠলেন যেন গরুটাকে দেখে। বামুনের দিকে তাকিয়ে বললেন—রাম, রাম, একি, এখানে গোহত্যা করল কে?

বামুন তো এবার মাথা চুলকোতে লাগল।

এতক্ষণ খুব বড়াই করে ইন্দ্রকে বলেছে, এটা আমি পুঁতেছি, সব গাছ আমার লাগানো, এসব আমি সাজিয়েছি, এ সব কিছু আমার নিজের হাতের তৈরি। এখন 'গরুটাকে আমি মেরেছি' মুখ দিয়ে আর বেরোতে চায় না কিছুতেই।

বামুনকে চুপ করতে দেখেই দেবরাজ এবার নিজের রূপ ধরলেন। তাকে ধমকে বললেন—তবে রে ভণ্ড! বাগানের যা কিছু ভালো, সব তুই করেছিস, আর খারাপ কাজটার বেলায় হাত দুটোকে দেখিয়ে বললি, এটা ইন্দ্র করেছে? কেননা হাতের মালিক ইন্দ্র। বটে! নে তোর গোহত্যার পাপ।

আর যায় কোথায়? পাপ তো ইন্দ্রর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, হুকুম পাওয়া মাত্র তেড়ে ফুঁড়ে ঢুকে পড়ল বামুনের শরীরে। গো-হত্যার পাপের শাস্তি তাকে পেতে হল।

[সংসারে কিছু সুবিধাবাদী লোক আছে যারা খারাপ কাজ করার পর নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ কাজ হয়েছে। অন্য সময়ে ঈশ্বরের কথা চিন্তাও করে না।]



॥ যেমন অভ্যেস ॥

বাজারে মাছ বিক্রি করে মেছুনী।

ঝুড়ি ভর্তি করে মাছ আনে বাজারে, কিন্তু বিক্রি হয়ে যায় চটপট। এমন সুন্দর করে কথা বলে খদ্দেরের সঙ্গে, যে একবার তার মাছের সামনে এসে দাঁড়ায়, সে মাছ না নিয়ে যেতে পারে না।

সেই কাক-ডাকা ভোর থেকে শুরু করে মাছের কারবার, আর তা চলে দুপুর পর্যন্ত।

বিক্রি হলেও কি নিস্তার আছে। আঁস-চুপড়িগুলোকে জলে ধোয়া, তাদের রোদে শুকোনো, বিক্রির জায়গাটাকে সাফ-টাফ করা— এসব করতে করতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল চলে আসে। তখন স্নান-খাওয়া করে একটু জিরোবার সময় পায় মেছুনী।

কিন্তু সে-ও আর কতটুকু সময়। সন্ধ্যের অন্ধকার হলেই চুপড়ি নিয়ে চলে আসতে হয় মাছের বড় বাজারে, মহাজনের কাছে। সেখানে অনেক দেখে শুনে কম পয়সায় ভালো মাছটি কিনে ঝুড়িতে চাপিয়ে রাতে বাড়ি আসে মেছুনী। তখনও বিশ্রাম নেই তার। বরফ-টরফ দিয়ে মাছগুলোকে ঠিকমত সাজিয়ে রাখতে হয়, নইলে মাছ পচে যাবে—সকালে উঠে বাজারে বিকোবে কি। সদা ব্যস্ত থাকতে হয় মেছুনীকে।

দিনরাত মাছ নিয়ে যার ঘাঁটাঘাটি, তার বন্ধু কিন্তু এক মালিনী। তার কারবার ফুল নিয়ে। রং বেরঙের নানারকম সুগন্ধি ফুল এনে বাজারে বেচে সে। সব ফুল যে রোজ বিক্রি হয় তা নয়, যা বিক্রি হয় না, তা বাড়িতে নিয়ে আসে। ঝুড়ি থেকে নামিয়ে মেঝেতে রাখে ফুলগুলো। আলতো করে জলের ছিটে দেয়। ফুলগুলো সতেজ থাকে তাতে। পরদিন বাজারে বিকোতে সুবিধে হয়।

মেছুনীকে অনেক দিন ধরেই মালিনী তার বাড়িতে যেতে বলছে।

প্রায়ই বলে—দিনরাতই তো কাজ নিয়ে থাকো তুমি, তা এসো না একদিন আমার বাড়ি। দুপুরে এখানে কাজ সেরে আমার বাড়ি যাবে, রাতে থাকবে খাবে, পরদিন সকালে উঠে আবার কাজে বেরোবে। দুজনে মিলে খুব গল্পগুজব করব 'খন।

মালিনীকে অনেকদিন ফিরিয়ে দিয়েছে মেছুনী। উপায় কি! ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই তার। অনেক কাজ থাকে আগে পরে। কিন্তু সেদিন কি মনে হল, দুপুরে বাজার শেষ হবার পর ওকে বলল—চল রে, আজ যাই তোর বাড়ি।

মালিনী তো পরম সমাদরে মেছুনীকে নিয়ে এল তার বাড়িতে। আসার সময় বাজার থেকে ভালো ভালো জিনিস কিনল, বন্ধুকে



সেগুলো রান্না করে খাওয়াল। তার ওপরে গল্পগুজব তো আছেই। গল্প যেন আর ফুরোতে চায় না। সেই গল্প থামল যখন, তখন বেশ রাত।

মালিনী বলল—আর থাক, এখন শুতে যাও। রাত অনেক হয়েছে। কাল আবার সকালে তোমায় বেরোতে হবে।

যে ঘরে ফুল রাখে, সেই ঘরে মেছুনীকে শুতে দিল মালিনী। নিজের সাথে একই বিছানায়। ছোট হলেও ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। তার ওপর নানা রকমের সুগন্ধি ফুলের গন্ধ ম ম করছে। এমন মিষ্টি গন্ধ খানিক সময় নাকে গেলে আপনা থেকেই ঘুম এসে যাবে। এসব কথা চিন্তা করেই মালিনী বন্ধুকে শুতে দিয়েছিল ঐ ঘরে।

মেছুনী তো ঐ সাজানো ঘরে শুতে এল। বন্ধুর সুন্দর ব্যবহারে সে খুশি। অনেক যত্ন-আত্মি করেছে তাকে মালিনী। শুলেই তো সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে না। শুয়ে তাই দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত গল্প-গুজবের নানা কথা মনে করতে লাগল।

দেখতে দেখতে রাত গভীর হল। কিন্তু আজ ঘুম আর আসছিল না মেছুনীর। চোখের পাতা বুঁজেও যেন বুঁজতে চাইছে না। সারা দিনের গল্পগুজবের কথাও আর ভাবতে ভালো লাগছে না। মেছুনী অনেক চেষ্টা করল ঘুমোতে, কিন্তু ঘুম এল না। শেষে শুরু হল অস্বস্তি। একবার উঠে বসে, একবার শোয়—এমন বিশ্রি অবস্থা।

পাশেই শুয়ে ছিল মালিনী। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেক আগেই। হঠাৎ ঘুমটা ভাঙ্গতেই চাঁদের আলোয় দেখে, বিছানার ওপর বসে আছে মেছুনী। মালিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—কি গো, এমন বসে আছ কেন? নতুন জায়গায় ঘুম আসছে না বুঝি?

মেছুনী মিনতি করে বলল—না গো, নতুন জায়গা বলে নয়। তোমার এই ঘরটায় ফুলের গন্ধ ভরে আছে, ঘুম আসছে না সেই গন্ধেই। তুমি ভাই আমার আঁস-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো?

—আঁস-চুপড়ি? মালিনী তো অবাক—ওটা দিয়ে কি করবে এখন?

মেছুনী বলল—আমার মাথার শিয়রে ওটা রাখব। রোজ তো ঐ চুপড়ি মাথার কাছে রেখেই ঘুমোই আমি। আজ ঐ চুপড়ি নেই বলেই ঘুম আসছে না।

বন্ধুর বাড়িতে আসার সময় মেছুনী চুপড়ি নিয়ে এসেছিল। মালিনী উঠে গিয়ে তা নিয়ে এল। মেছুনীর মাথার শিয়রে রাখল। ওর কথামত খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল তাতে। অমনি ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে, মাছের আস্টে গন্ধে ঘর ভরে গেল। মেছুনী মিথ্যে বলে নি। মালিনী দেখল, মাছের চুপড়িগুলো রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেছুনী নাক ডেকে ঘুমোতে শুরু করেছে খুব আরামে।

[যার যা অভ্যেস, সে তাই করবে।]



।। ড্যাম ড্যাম ড্যাম ।।

আধা-শহুরে জায়গায় থাকে এক নাপিত। লেখাপড়া সে জানে না বটে, তবে তার হাতের ছুরি-কাঁচি-ক্ষুর যেন কথা কয়। তার কামানোর সুনাম সর্বত্র। সব সময়েই তাই তার কাছে ভিড় লেগেই থাকে।

সেদিন নাপিত দাড়ি কামাচ্ছিল এক ভদ্রলোকের। শহরের ইংরেজি জানা সাহেব মানুষ। এখানে এসেছেন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে, তিনিই নাপিতের খুব সুনাম করেছেন, ভদ্রলোক তাই তার কাছেই দাড়ি কামাতে এসেছেন।

দাড়ি কামাতে কামাতে নাপিত কথা বলছিল একজনের সঙ্গে। তা অমন কথা তো নাপিতরা অনেক সময়েই বলে থাকে কাজের সময়ে। খুব একটা ক্ষতি তাতে হয় না, কারণ কথা বললেও নাপিতের চোখ আর মন থাকে ঠিক ক্ষুরের দিকে।

সেদিন কিন্তু কথা বলতে বলতে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল নাপিত। তাই দাড়ি কামাতে গিয়ে একটুখানি কেটে গেল সাহেব ভদ্রলোকের গাল। খুবই সামান্য একটুখানি। একটা 'উঃ' শব্দ করেই একটু রাগের মুখে বলে উঠলেন ভদ্রলোক—ড্যাম!

সামান্য একটা কথা। কোন গালাগাল নয়, চিৎকার নয়, শুধু ছোট্ট একটা শব্দ ঃ ড্যাম!

নাপিত 'ড্যাম' শব্দটার মানে জানত না। সে কিন্তু শব্দটা শুনেই ক্ষেপে উঠল, ভাবল, ভদ্রলোক তাকে গাল দিয়েছেন। অমনি ক্ষুর-টুর ফেলে রেখে জামার আস্তিন গুটিয়ে বলল—কামাতে কামাতে আচমকা লেগে গেছে, তা এরকম একটু আধটু লাগতেই পারে। আমি তো আর ইচ্ছে করে ব্যথা দেই নি। এতে আমার কোন দোষ নেই, তবু তুমি আমাকে বললে ড্যাম?

ভদ্রলোক তো নাপিতের রুদ্র মূর্তি দেখে অবাক। শান্তভাবে

বললেন—আরে বাপু, তোমায় কিছু খারাপ কথা বলিনি। আর ড্যাম মানে এমন কিছু খারাপ কথা নয়। তবে লক্ষ্মী বাবা, একটু সাবধানে কামাও, নইলে যে আমার গাল চিরে যাবে।

নাপিত অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়—উহুঁ, ওসব মন-ভোলানো কথা এখন বললে হবে না। আগে বল, ঐ যে বললে ড্যাম, ও কথাটার মানে কি। নইলে আমি তোমায় কামাতে পারব না।

নাপিতের একগুঁয়েমি দেখে ভদ্রলোক প্রমাদ গুণলেন। দু গালে এখনও সাবান মাখানো, সবে কামাতে শুরু করেছিল নাপিত, এখন বলে কিনা কামাবে না! ভদ্রলোক দেখলেন, মূর্খ নাপিতের সঙ্গে হৈ-চৈ করে লাভ নেই। শান্তভাবে তাই আবার বললেন—আরে বাপু, বললাম তো ও কথাটার মানে কিছু খারাপ নয়, এটা একটা ইংরেজি কথা। যে কোন লোককে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। দোহাই বাপু, তুমি আমায় দাড়ি কেটে ছেড়ে দাও।

যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার, কথাটা শুনে একটু আশ্বস্ত হল সে। তবু তার মন থেকে সন্দেহ গেল না। কথাটা ইংরাজী, ইংরাজী জানে না নাপিত। এদিকে ভদ্রলোকও বিশেষ কিছু রাগারাগি করেন নি। তাই আবার ক্ষুর হাতে নিয়ে কামাতে শুরু করার আগে ভদ্রলোকের দিকে চোখ পাকিয়ে বললে—শোন সাহেব! ড্যাম মানে যদি ভালো হয় তবে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চোদ্দ পুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তবে তুমি ড্যাম, তোমার বাপ ড্যাম, তোমার চোদ্দ পুরুষ ড্যাম। শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যাম!

নাপিতের কথা শুনে ভদ্রলোক হাসবেন না রাগ করবেন, ঠাহর করতে পারলেন না। তিনি দাড়ি কামাতে এসেছেন, তাই চুপ করে রইলেন।

[মূর্খের কাছে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।]



॥ একদন্তী গণেশ ॥

গণেশ হলেন শিব-দুর্গা দুজনেরই প্রিয় সন্তান। গণেশও ভীষণ ভালবাসেন মা বাবাকে। সেজন্যই তো শিব-দুর্গা গণেশকেই কৈলাসে নিজেদের বাড়ির প্রহরী করেছেন।

তা গণেশ সেই কাজের দায়িত্ব পালন করেন ভালোভাবেই। তাঁর নজর এড়িয়ে একটা পিঁপড়ের পর্যন্ত বাড়িতে ঢোকার উপায় নেই, মানুষ বা দেবতা তো কোন্ ছার!

সেদিন শিব-দুর্গা ঘুমোচ্ছেন, গণেশ যথারীতি দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন, এমন সময় পরশুরাম এসে হাজির। পরশুরাম হলেন বিরাট বীর, তার ওপর শিব হলেন তাঁর গুরু। অনেকদিন গুরুকে দেখেন নি, আজ খুব ইচ্ছে হয়েছে, গুরুকে একবার দর্শন করেন, তাই চলে এসেছেন। দরজায় যে দাঁড়িয়ে আছেন গণেশ, সেদিকে তেমন ভ্রূক্ষেপই না করে বললেন—আমি শিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

গণেশ শান্তভাবে বললেন—উনি ঘুমোচ্ছেন, এখন দেখা হবে না। তুমি অন্য সময় এসো।

পরশুরাম হলেন নাম করা বীর, খুব বড় যোদ্ধা। গণেশের কথাগুলোকে তাঁর তাচ্ছিল্য বলে মনে হল। জোর দিয়ে বললেন—আমার নাম পরশুরাম, অনেক দূর থেকে এসেছি। এখুনি একবার দর্শন চাই।

বলেই এক রকম জোর করে গণেশকে পেরিয়ে ঢুকতে গেলেন ভেতরে।

এবার গণেশের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল। দেখা করতে এসেছেন একজনের সঙ্গে, সে ঘুমোচ্ছে শুনে কোথায় হাতজোড় করে বলবে, দয়া করে যদি একটু দেখা পাওয়ার ব্যবস্থা করেন তো ভালো হয়—তা নয়, লোকটা বলে কিনা এখুনি দর্শন চাই! ঐ কথাকে যদি বা ক্ষমা করা

যায় তো পরের ব্যাপারটা? গণেশকে পেরিয়ে জোর করে ঢুকতে চাইছে!

তা গণেশও তো কম যান না। দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র তিনি, নিজেও মহা শক্তিধর। পরশুরামের স্পর্ধা তিনি সহ্য করবেন কেন? বাঁ হাত বাড়িয়ে পরশুরামকে আটকালেন। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন —তুমি যেই হও, এখন ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

—দেবে না ঢুকতে? এত বড় কথা?

বাধা পেয়ে পরশুরাম রাগে জ্বলে ওঠেন। দু চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ঠিকরে বেরোতে থাকে।

তা ওসব আগুন-টাগুনকে পরোয়া করবেন কেন গণেশ? তেমনি হেসে পথ আগলিয়ে বলেন—না। শিব এখন ঘুমোচ্ছেন, এই সময় তাঁকে জাগানো যাবে না।

—আমি তাঁর শিষ্য।

পরশুরাম এবার জোর দিয়ে বললেন,

—তুমি যেই হও, এখন যেতে পারবে না।

এ রকম কথা কাটাকাটি চলতে লাগল দুজনের মধ্যে। দুজনের একই জেদ, একজন ঢুকবেনই, আর আরেকজন ঢুকতে দেবেন না।

ধীরে ধীরে মেজাজ চড়তে থাকে দুজনের।

পরশুরাম বলেন—আমার নাম পরশুরাম, চেনো আমায়? রাগের চোটে সারা পৃথিবীর সব ক্ষত্রিয়দের একবার মেরে ফেলেছিলাম।

গণেশ বললেন—আরে ধুর! কোথাকার কে তুমি, ভারি বড়াই করছ। ক্ষত্রিয়দের মেরেছে তো কি হয়েছে। আমায় চেনো? আমি গণেশ।

কথা-কাটাকাটি থেকে তর্কাতর্কি। তারপর একেবারে হাতাহাতি, মারপিট। গণেশ অনেকক্ষণ ধরেই পরশুরামকে সহ্য করতে পারছিলেন না, এবার তাঁকে ধরে ত্রিভুবন ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারলেন মাটিতে। পাক খেতে খেতে পরশুরাম ধপ করে এসে পড়লেন মাটিতে।

এবার জ্বলে উঠল পরশুরামের ক্রোধ। গুরুকে দেখার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারবে না। প্রথম চোটে

ঘায়েল হলেন বটে, কিন্তু তিনিও ছেড়ে দেবেন না তাঁকে। গুরুর দেওয়া অজেয় পরশু বান আছে তাঁর। উঠে দাঁড়িয়ে সেটিই তাক করে মারলেন গণেশকে।

শিবের দেওয়া অস্ত্র, তার তেজ তো শিবের মতই হবে। বাণ ছোঁড়া মাত্রই দু চোখে অন্ধকার দেখলেন গণেশ। গায়ে এসে যখন লাগল, মনে হল যেন একটা পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। নেহাৎ গায়ে অসম্ভব জোর তাঁর, তার ওপর শিবের ছেলে, তাই মরলেন না। কিন্তু পরশুর প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর হাতিমুখো শুঁড়ওয়ালা দুই দাঁতের একটা ভেঙ্গে পড়ল। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। অজ্ঞান হয়ে গেলেন গণেশ।

এদিকে গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল শিব-দুর্গার। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, গণেশের এই অবস্থা। হায় হায় করে উঠলেন মা দুর্গা। বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। গণেশ তাঁর প্রিয় পুত্র। তার গায়ে আঘাত করেছে কোথাকার কে পরশুরাম!

আগুন জ্বলে উঠল ভগবতীর দু চোখে। শূল তুলে নিলেন তিনি। তাক করলেন পরশুরামের দিকে। ছেলের গায়ে হাত তোলা—এত বড় আস্পর্ধা! শোধ নেবেন তিনি।

পাশে দাঁড়িয়ে শিব এতক্ষণ সব কিছু দেখছিলেন। শান্ত, ধীর, স্থির।

ভগবতী শূল তুলতেই প্রমাদ গুণলেন তিনি। সর্বনাশ! এ কি করছে গণেশ জননী? এ যে মারাত্মক অস্ত্র। পরশুরাম তো কোন্ ছার, এই শূলের আঘাতে পৃথিবী এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। এক পরশুরামকে মারতে গিয়ে কত নিরীহ লোক মারা পড়বে, তার ঠিক নেই। পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

শিব এসে হাত চেপে ধরলেন দুর্গার—ঐ শূল তুমি ছুঁড়ো না ভগবতী। কথা শোন দেবী।

তুমি বিশ্বজনের মাতা, অভয়দায়িনী, করুণাময়ী, কল্যাণেশ্বরী। তোমার কি এমন কাজ সাজে?

ভগবতী তখন ক্রোধে জ্বলছেন। বললেন—না, আজ আমি তোমার কথা শুনব না। আমার গণেশের গায়ে হাত তুলেছে যে, তার রক্ষা নেই।

শিব তখন অনেক করে দুর্গাকে বোঝালেন। বললেন—কোন কাজ করার আগে একটু ভাবতে হয় ভগবতী। আর, না ভেবে ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করে বসলে পরে পস্তাতে হয়। পরশুরামকে তুমি মারতে চাইছ, কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ, ও তোমার কে? আর কিই বা সম্পর্ক ওর সাথে আমার?

ভগবতীর রাগ একটু কমে। জিজ্ঞেস করেন—কে?

—ও আমাদের ছেলে। শিব বলেন।

—ছেলে? ভগবতী আচর্য্য হন—পরশুরাম আমাদের ছেলে হবে কি করে?

শিব শান্তভাবে বললেন—পরশুরাম আমার শিষ্য। শাস্ত্রে আছে, শিষ্য হল ছেলের মত। তাই গণেশের মত পরশুরামও তোমার ছেলে। মা হয়ে তুমি ছেলেকে মারবে কি করে? পরশুরাম অন্যায় করেছে ঠিকই, কিন্তু ঐ একই কাজ গণেশ করলে তুমি তাকে যেমন ক্ষমা করতে, পরশুরামকেও তেমনি ক্ষমা কর। তুমি যে তার মা।

এবার ভগবতীর রাগ কমল। পরশুরামকে তিনি ক্ষমা করলেন। পরশুরাম বাঁচলেন, পৃথিবীও বাঁচল একটা বিপর্যয়ের হাত থেকে।

এদিকে দৈব-বৈদ্যরা অজ্ঞান গণেশের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। আবার উঠে বসলেন গণেশ। দেখে সব দেবতার মুখে হাসি ফুটল।

মাঝখান থেকে লোকসান হল গণেশেরই। তাঁর একটা দাঁত গেল। তবে তিনি হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। মাটি থেকে তুলে নিলেন নিজের ভাঙ্গা দাঁত খানা। সেটিকে নিজের যোগদণ্ড করলেন। রইল একখানা দাঁত।

সেই থেকে গণেশের নাম হল 'একদন্তী'।

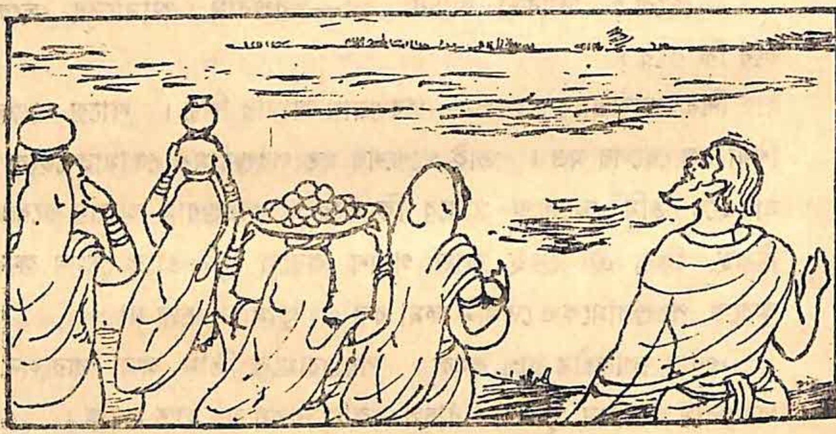
[শিষ্য পুত্রের মত। গুরুর উচিত, শিষ্যকে ছেলের মত দেখা।]



।। আত্মা খায় না ।।

মুনিদের সেরা ছিলেন পরাশর। তাঁর ছেলে ব্যাসদেবও তেমনি বড় সাধু। খুব বড় পণ্ডিত। রচনা করেছিলেন 'মহাভারতের' মত বিখ্যাত মহাকাব্য। মহাভারত রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন তিনি।

সেই ব্যাসদেব সেদিন ঘুরতে ঘুরতে এসেছেন যমুনা নদীর তীরে। বড় সুন্দর বেগবতী নদী। কুলুকুলু করে বয়ে চলেছে তার নীল জল! দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।



ব্যাসদেব খানিক সময় যমুনার তীরে বসে কাটালেন। উদ্দেশ্য, নদীর ওপারে যাবেন। কিন্তু নৌকোর দেখা নেই। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরও খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হল তাঁকে।

এরই মধ্যে হৈ-হৈ করতে করতে গোপীরা সেখানে এসে হাজির। তাদের সঙ্গে দুধ আর দইয়ের ভাঁড়। এ ছাড়া রয়েছে নানা খাবার। তারাও নদীর ওপারে যাবে। নৌকোর দরকার তাদেরও। কিন্তু নৌকোর তো দেখা নেই। তাকিয়ে দেখে এক সাধুও দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাল তারা। সময় কাটানোর জন্য গল্প শুরু করল।

সেই সকাল থেকে ব্যাসদেব অপেক্ষা করছেন। তার ওপরে

গোপীদের সঙ্গে অত কথা—ব্যাসদেবের খিদে পেয়ে গেল। আর থাকতে না পেরে গোপীদের বলেই বসলেন সে কথা—আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

গোপীরা তো শুনে খুব খুশিই হল। আহা, সাধু মানুষ, তাঁকে সেবা করতে পারার মত পূণ্য আর আছে। তারা বললে—আপনি খাবেন, এ তো খুব ভালো কথা। আমাদের সঙ্গেই দুধ-ক্ষীর-সর-ননী রয়েছে, আপনি খান। আমরা সাধুসেবা করে ধন্য হব।

ওদের কথায় খুশি হলেন ব্যাসদেব। রাজি হলেন খেতে।

মুনির খাওয়া। উপবাসে থাকেন তো এক বিন্দু জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন না, আবার খেতে শুরু করলেন তো সাংঘাতিক ব্যাপার। খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই। সব ভাঁড় প্রায় উজাড়।

খাবার ফাঁকে ফাঁকে নৌকোর খোঁজ নিচ্ছিলেন ব্যাসদেব। তখনও দেখা নেই নৌকোর। আশ্চর্য্য, তখনও ঘাটে একটা নৌকো এসে ভেড়ে নি। এদিকে ক্রমশ বিকেল হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। তখন ওপারে যাওয়াই যাবে না।

ব্যাসদেবের মত গোপীরাও উতলা হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যের আগে ওপারে পেঁছতেই হবে। ওদিকে অনেক খদ্দের রয়েছে। তাদের সঙ্গে আজই কথা বলতে হবে। নইলে ব্যবসার ক্ষতি হবে।

কিন্তু নৌকো যে আসছে না। ওপারে যাওয়া যাবে কি করে। কি বিপদ!

একজন বললে—ব্যাসদেবকেই বলা যাক না। উনি তো অত বড় সাধু। নদী-পারাপারের যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন। তাই একজন এসে অনুরোধ করল সাধুকে ওপারে যাবার কোন ব্যবস্থা যদি করে দেন।

ব্যাসদেব শুনে বললেন—বেশ, যমুনাকে আমি অনুরোধ করতে পারি আমাদের নদী পার করিয়ে দিতে।

এই বলে যমুনার দিকে তাকিয়ে বললেন—যমুনে, আমি যদি কিছু

না খেয়ে থাকি, তোমার জল দু ভাগ হয়ে যাবে, আর মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা সোজা চলে যাব।

আশ্চর্য্য! যেমন কথা তেমনি কাজ। যমুনা মুনির বাধ্য মেয়ের মত দু ভাগ হয়ে গেল।

গোপীরা তো অবাক। অবাক হয়ে হবে কি। মাঝখানে ঠিক ওপারে যাবার পথ হয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে পার হয়ে গেল সকলে।

গোপীরা ওপারে গিয়ে মুনির কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। মুনি যমুনাকে বলেছিলেন, তিনি কিছু খান নি। কিন্তু তার আগে তো তিনি খেয়ে সব ভাঁড় উজাড় করে দিয়েছিলেন। দুটো ব্যাপারের মধ্যে মিল কোথায়।

জবাব দিলে এক বৃদ্ধ গোপী। বললে—মুনি ঐ যে বলেছেন 'আমি খাই নি' তার মানে তাঁর শরীর খেয়েছে, কিন্তু আত্মা খায় নি। আত্মা হল নির্লিপ্ত—তার খিদে তেষ্টা, জন্ম-মৃত্যু কিছুই নেই।



॥ মুচি যখন চাকর ॥

এক গুরু চলেছিলেন শিষ্যের বাড়ি। এমনিতে জিনিষপত্র যা প্রয়োজন সবই আছে, শুধু নেই একটা জিনিষ—একটা চাকর। তাঁর চাকরটা চলে গেছে দেশে। তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে কাউকে খুঁজেও নিতে পারেন নি।

পথে বেরিয়ে গুরু ঠিক করলেন, পথের মাঝে তো অনেক লোককে দেখবেন, তাদেরই একজনের সঙ্গে কথা বলে চাকর হিসেবে নিয়ে নেবেন।

সত্যিই পথের মাঝে একটা লোককে দেখতে পেয়ে গুরু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ওরে, আমার সঙ্গে যাবি? ভালো খেতে পাবি, আদরে থাকবি। রাজি থাকিস্ ত চল।

লোকটা ছিল মুচি। সে গুরুর দিকে তাকিয়ে দেখল, গলায় পৈতে, তার মানে বামুন। একটু ইতস্তত করে আমতা আমতা করে বলল—ঠাকুর, আমি জাতে মুচি, নিচু জাত। কেমন করে আপনার চাকর হই, বলুন তো।

গুরু কিন্তু তাকে খুব অভয়ই দিলেন। বললেন—কোন ভয় নেই তোর। শুধু একটা কথা মনে রাখিস। কাউকে তোর নিজের পরিচয় দিস না, কারুর সঙ্গে আলাপও করিস না। চুপচাপ থাকবি।

নিশ্চিন্ত হয়ে রাজি হল মুচি। গুরুর সঙ্গে এল শিষ্যের বাড়ি।

সারাটা দিন মোটামুটি ভালো ভাবেই কাটল। মুচি কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে নি, তাকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞেস করে নি।

মুসকিল বাঁধল সন্ধ্যেবেলায়। গুরু তখন শিষ্যের বাড়িতে সন্ধ্যে করতে বসেছেন, এমন সময় আর এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির। সামনে ঐ মুচিকে বসে থাকতে দেখে বুঝলেন, এ হল গুরুর চাকর। তাকে বললেন—আমার জুতো জোড়া এনে দে তো!

চাকর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

আবার তাড়া দিলেন ব্রাহ্মণ—কি রে, কি বললুম তোকে? জুতো-জোড়া এনে দে!

চাকর তাতেও চুপ করে রইল।

ব্রাহ্মণ এবার রেগে গেলেন—কি রে, কথা কইছিস না কেন?

চাকর তবু নড়ে না।

এবার ব্রাহ্মণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ধমকে উঠলেন—আরে বেটা, বামুনের কথা শুনছিস না? তুই কি জাত, মুচি নাকি?

চাকর তখন ভয়ে উঠে দাড়াল। কাঁপতে কাঁপতে গুরুর দিকে তাকিয়ে বলল—ঠাকুরমশাই গো, ও ঠাকুরমশাই! এনারা আমায় চিনে ফেলেছেন! আর নয়। আমি পালাই!

বলেই সেই যে চাকর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড় লাগাল, আর ফিরল না।



॥ কেউ কারুর নয় ॥

গুরুর ওপরে শিষ্যের খুব বিশ্বাস। তিনি যা বলেন, শিষ্য তাই মন দিয়ে শোনে, তাঁর প্রতিটি উপদেশকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করে।

সেদিন কথা উঠেছিল সংসারে থাকা নিয়ে। গুরু শিষ্যকে বললেন—সংসার মিথ্যে, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। ঈশ্বরই তোর আপনার, আর কেউই তোর আপনার নয়।

গুরুর আর সব কথা মন দিয়ে শুনে তা বিশ্বাস করলেও এ কথাটা মানতে শিষ্যের যেন মন চাইল না। সে বেশ ইতস্তত করে বলল—একি কথা বলছেন প্রভু। আমার মা-বাপ-বউ—এরা আমায় খুব ভালোবাসে, এদের আমি ছেড়ে যাই কেমন করে।

গুরু বললেন—ও সব তোর মনের ভুল। কেউ তোর আপনার নয়। সব মিছে মায়া।

তা শিষ্যর কিছুতেই মন সায় দেয় না গুরুর কথায়।

গুরু দেখলেন, শুধু কথায় শিষ্যের মনের ধারণা পালটাবে না। অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। একটু ভেবে নিয়ে তাই তিনি শিষ্যকে বললেন—তোকে একটা ওষুধের বড়ি দিচ্ছি, তুই তাই খেয়ে শুয়ে থাক বাড়িতে। লোক মনে করবে তুই মরে গেছিস। কিন্তু আসলে তুই সব দেখতে শুনতে পাবি, তোর জ্ঞান টনটনে থাকবে। আমি সেই সময় তোর বাড়িতে গিয়ে উঠব।

যেমন বলা, তেমনি কাজ হল। শিষ্য সত্যিই বাড়িতে এসে ঐ বড়ি খেয়ে মড়ার মতন হয়ে গেল। কান্নাকাটি পড়ে গেল বাড়িতে। মা কাঁদে, বউ কাঁদে, ছেলেপুলে কাঁদে। সবাই কাঁদছে বুক চাপড়ে—ওকে ছাড়া আমি কি করে থাকব গো। আমার কি হবে গো।

কান্নার রোল যখন গোটা বাড়িতে, তখন শিষ্যের বাড়িতে কবিরাজের বেশে গুরু এসে হাজির। তাঁকে দেখেই তো সকলের কান্না

আরও উথলে উঠল। গুরু সকলকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয় নেই, এর একটা ওষুধ আছে, সেটা খাওয়ালেই বেঁচে উঠবে রোগী।

বাড়ির সবাই তো হাতে স্বর্গ পেল। মা বললে—তাই করুণ কবরেজমশাই, আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন। ও না থাকলে আমিও মরব।

বউ বললে—ওকে ছাড়া আমার বেঁচে থেকে কি লাভ বলুন কবরেজ-মশাই। আপনি যদি ওর জীবন দিতে পারেন ভালো, নইলে আত্মহত্যা করব আমি।

গুরু তখন বললেন—তোমাদের কোন চিন্তা নেই। আমার হাতে এমন রোগীকে বাঁচানোর ওষুধ আছে। তবে, একটা কথা। ওষুধটা আগে একজনকে খেতে হবে। তারপর রোগীকে দেব। আগে যিনি খাবেন তিনি কিন্তু অক্কা পাবেন। তা এখানে তো এর মা-বউ এবং অন্য সকলেই আছেন, এখন আমায় বলুন আপনাদের মধ্যে কাকে ওষুধটা দেব? কে খাবেন? যে কেউ একজন গেলেই ছেলেটি বেঁচে ওঠে।

গুরুর কথায় সারা ঘরে নীরবতা নেমে এল।

কারো মুখে কোন কথা নেই। একটু আগে যারা কাঁদছিল তারা সবাই কান্না থামিয়ে চুপ করে আছে। এইমাত্র যে কথাটা গুরুদেব বললেন সে কথাটা কি ভয়ানক! কি কঠিন।

তাঁর আগের কথায় যতটা উৎসাহিত হয়ে ছিল সবাই, এখন শেষের কথায় ততটাই যেন মিইয়ে গেল। যে খাবে, সে-ই তো মারা যাবে। কিন্তু খাবে কে? সকলেই তাই এখন চুপ করে রইল।

শিষ্য তো এদিকে মরার মত শুয়ে থেকে সব শুনছে।

কবিরাজ প্রথমে মাকে ডাকল—আপনি তো মা, এই সন্তান আপনার সবচেয়ে প্রিয়। তা এর জন্য যদি আপনিই ওষুধটা খান—

মা কিন্তু রাজি হল না। বলল—এ ছেলে আমার প্রিয় ঠিকই, কিন্তু এ সংসার খুব বড়। এত বড় সংসারটা দাঁড়িয়ে আছে শুধু আমার ওপর। আমি গেলে কে এসব দেখবে শুনবে, তাই ভাবছি।

বউ এতক্ষণ 'ওকে ছাড়া আমার বেঁচে থেকে কি লাভ, আমি আত্মহত্যা করব' বলে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছিল। কবিরাজ এবার তাকেই ডেকে বললেন—মার যখন আপত্তি, তখন তুমিই এসো মা। তোমার কাছে তো স্বামিই সব, স্বামিকে তুমি খুব ভালবাসতে।

বউ মাথা নেড়ে বললে—তা বাসতুম, কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আমার অনাথ ছেলেপিলেগুলোর এখন কি হবে। আমি যদি যাই, কে দেখবে এদের ?

এবার শিষ্যের বড়ির নেশা ঘুচে গেল। ভেবে দেখল, গুরুদেব তো মিথ্যে বলেন কি, মা-বউ-ছেলেপুলে কেউই তার আপনার নয়, তার বিপদে কেউ নেই। বৃথাই সে এতদিন এদের নিয়ে ভেবেছে। ভেবেছে, তার বিপদে সবাই প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাতে। আসলে এরা কেউই তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে নি, শুধু মুখেই বলেছে। তাকে নয়—ভালবেসেছে তার টাকাকে, তার দেওয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে। সেজন্যই তার মৃত্যুর কথা শুনে কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না।

শিষ্যের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল এবার। সকলের অবাক চোখের সামনে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'গুরুদেব চলুন। সংসারে থেকে আর লাভ নেই।'

[সংসারে কেউই আপন নয়।]



॥ বিশ্বাসে মিলায় বস্তু ॥

রাম-রাবণে তখন যুদ্ধ চলেছে।

বিভীষণ রাবণের ভাই, কিন্তু রামভক্ত। রামের বউ সীতাকে চুরি করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন রাবণ। বিভীষণ এর প্রতিবাদ করেছিলেন, সেই দোষে রাবণ তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন লঙ্কা থেকে। বিভীষণ তখন আর কি করেন, এপারে এসে যোগ দিয়েছিলেন রামের দলে। রাম নিজে খুবই ভালবাসতেন বিভীষণকে। সেই থেকে বিভীষণ রইলেন রামের সাথে। আর সকলের মত রামেরা হয়ে রাবণের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

রামের বড় ভক্ত হিসেবে বিভীষণের নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।



সেই সময়ে একদিন একটি লোক এসে বলল তার ওপারে যাওয়া তার খুব দরকার। কিন্তু সেতু নেই, যাবে কি করে। নিরুপায় হয়ে সে তাই এসেছে বিভীষণের কাছে। উনি তো বড় ভক্ত, যদি মুসকিল আসান করতে পারেন।

বিভীষণ সব শুনে বললেন—চিন্তার কিছু কারণ নেই। নাই বা থাকল সেতু, তুমি ঠিক সাগর পার হয়ে যাবে। এই জিনিসটা তোমায়

দিলুম, কাপড়ের খুঁটে এটা বেঁধে নাও। এর জোরে তুমি সহজেই সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে। শুধু একটা কথা। কাপড়ের খুঁটটা খুলো না কিন্তু, ভেতরে কি আছে দেখো না।

লোকটা মাথা নেড়ে বিভীষণের কাছ থেকে ঐ জিনিসটা নিয়ে সাগরের তীরে এল। বিভীষণ যখন বলেছেন, তখন সে নির্ঘাৎ সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে, এ বিশ্বাস তার এল। অমনি সে সত্যিই সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল।

লোকটা চলছিল বেশ। এল অনেকটা পথ।

হঠাৎ তার মনে হল, কাপড়ের খুঁটটা খুলে বিভীষণ কি দিলেন তা একবার দেখলে হয়। কি এমন জিনিস সেটা, যার জোরে আমি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি?

এই ভেবে সে কাপড়ের খুঁটটা খুলল।

খুলে দেখল, কিছুই নয়, একটা পাতার ওপরে শুধু রাম-নাম লেখা। লোকটার মন থেকে অমনি বিশ্বাস চলে গিয়ে তাচ্ছিল এল। ও মা; এই জিনিস! এর এত ক্ষমতা!

যেমনি এই কথা ভাবল লোকটি, অমনি ডুবে গেল সে। ওপারে যাওয়া আর তার হল না।

[বিশ্বাসের জোর অনেক। বিশ্বাস করলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়।]



॥ ভগবানকে দেখা ॥

এক সাধুর কাছে যেত একটি লোক। সাধুর মুখে সব সময় হাসি, তাঁর সুন্দর ব্যবহার—এসব দেখে লোকটি ক্রমেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। সাধুর মুখের কথা শোনার জন্য বহু দিন সে নিজের কাজ ফেলে রেখে চলে যেত তাঁর কাছে। তাঁর উপদেশ শুনতে চাইত।

একদিন সাধু বললেন—আর কি উপদেশ দেব, ভগবানকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস।

লোকটি বললে—কিন্তু ভগবানকে কোনদিন দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানি না, কি করে তাঁকে ভালবাসব?

সাধু তার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। বুঝলেন, লোকটির মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবিশ্বাস আর সন্দেহ, শুধু মুখের কথায় কাজ হবে না। এমন কিছু একটা করতে বলতে হবে তাকে, যাতে ওর মনে বিশ্বাস ফিরে আসে।

সাধু জিজ্ঞেস করলেন—এ সংসারে তুমি কাকে ভালবাস?

লোকটি বলল—আমার কেউ নেই। শুধু একটা বেড়া আছে, ঐটিকেই ভালবাসি।

সাধু বললেন—ব্যস্, ওতেই হবে। ঐ বেড়ার মধ্যেই নারায়ণ আছেন জেনে ওটিকেই মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস আর সেবা কর।

এই বলে সাধু চলে গেলেন।

লোকটিও বেড়ার মধ্যে নারায়ণ আছেন বিশ্বাস করে তাকে প্রাণপণ সেবা করতে শুরু করল।

বেশ কয়েক বছর পর সাধু এলেন লোকটির কাছে। সে তো পরম সমাদরে সাধুকে ঘরে বসাল। সাধু জিজ্ঞেস করলেন—কি হে, কেমন আছ!

লোকটি তাকে প্রণাম করে বলল—গুরুদেব, আপনার কৃপায়

বেশ আছি। আপনি যেমন বলেছিলেন, আমি ঠিক সেই মতই চলছি।

—কি রকম?

সাধু এবার হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটি বলল—আপনি ভাবতে বলেছিলেন, বেড়ার মধ্যে ভগবান আছে। আমি সেই রকম ভেবে বেড়ার মধ্যে এখন এক অপরূপ সুন্দর মূর্তি দেখতে পাই। তার চার হাত, এক এক হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম।

সাধুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন—রোজ দেখ?

লোকটি বলল—হ্যাঁ গুরুদেব। আপনার কৃপায় এখন রোজই মূর্তিটিকে দেখতে পাচ্ছি।

[ভগবান কোন একটা বিশেষ জায়গায় নেই তিনি সর্বত্র আছেন।]





।। যখনকার যা কাজ ।।

বৃষ্টির কি যে হল, আষাঢ় মাস গেল শ্রাবণ মাসও যায় যায়, তবু বৃষ্টির দেখা নেই। ধান চাষের বুঝি বারোটা বাজল। অনেক আশা নিয়ে চাষী যে ধান রুয়েছিল, তা শুকিয়ে যাবার দাখিল হল।

একেবারে চাষীর ভাতে কাপড়ে মরার উপক্রম।

তা একেবারে হাল ছাড়লে তো চলে না। জল যদি একেবারেই না হয়, তা বলে তো একেবারে গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না—অন্য চেষ্টা চরিত্র তো করতে হবে। চাষীরা সবাই তাই চেষ্টা শুরু করল খাল কেটে নদী থেকে ক্ষেতে জল আনার।

সবাই রোজ একটু একটু করে খাল কাটার চেষ্টা করে।

এদের মধ্যে একজনের মাথায় হঠাৎ ভাবনা এল, রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে। কালই খালে-নদীতে যোগ করে দেব। কে জানে, কাল যদি মরে যাই, ঘরে মা, বউ, ছেলে, মেয়ে সব তো না খেয়ে মরবে। তাই পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সেই সকাল থেকে একনাগাড়ে খাল কেটে চলল।

এদিকে বেলা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল অথচ চাষী খেতে আসছে না দেখে চাষী-বউ তার মেয়েকে দিয়ে মাঠে তেল পাঠিয়ে দিল, চান করে আসবার জন্য।

মেয়ে তো চাষীর এক ধমক খেয়ে দৌড়ে পালাল। মাকে এসে জানাল—বাবা আসবে না এখন। বলল, খাল কাটা হলে তারপর আসবে। চান খাওয়া সব বন্ধ।

চাষী-বউ আর একটু সময় অপেক্ষা করল, তারপর বিরক্ত হয়ে ঠিক করল, নিজেই যাই। ভালো জ্বালা, আজ আবার ঘাড়ে কি ভূত চাপল। আমি হাঁড়ি নিয়ে আর কতকাল বসে থাকব। একটা বিবেচনাও নেই যে, খেয়ে-দেয়ে নিয়ে তারপর কাজ করতে হয়? কাজের ঝোঁকে নিজের ক্ষিধে-তেষ্টা নেই বলে কি সবার তাই?

নিজের মনে এই রকম সাত-পাঁচ বকতে বকতে চাষী-বউ শেষ পর্যন্ত চলে এল ক্ষেতে। এসে দেখে, চাষী সমানে কোদাল চালাচ্ছে। তার সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে, তবু কোন দিকে তার খেয়াল নেই।

চাষী-বউ তা দেখে চাষীর সামনে গিয়ে বলল—বলি হ্যাঁগো, ভাতগুলো যে কড়কড়িয়ে গেল। নেয়ে-খেয়ে নিয়ে কাজটা করলে হতো না?

চাষী সে কথার জবাব না দিয়ে বউকে বলল—তুমি যাও তো এখান থেকে। আমায় কাজটা শেষ করতে দাও।

চাষী-বউ বলল—তার মানে? খেয়েদেয়ে নিলে হতো না?

চাষী আবার রুক্ষভাবে বলল—তুমি শিগগির যাবে কিনা? নইলে মেরে তাড়াব।

বলেই হাতের কোদাল তুলল সে সত্যি সত্যি।

চাষী-বউ বুঝল না, হঠাৎ কি এমন হল, চাষী তাকে মারতে কোদাল তুলল। কিন্তু সে কথা বলবে কি, চাষীর ভয়ানক চেহারা দেখে ভয় পেয়ে 'তবে থাক গে' বলে ওখান থেকে পালাল।

চাষী অমনি মাটি কাটতে শুরু করে দিল। কোন দিকে তার হুঁশ নেই। কাজ ফেলে রাখলে চলবে না। আজকেই শেষ করতে হবে।

অবশেষে সন্ধ্যের আগে চাষীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সফল হল। নদীর সঙ্গে খালের যোগ হল, কুলকুল করে খাল দিয়ে জল আসতে লাগল। সে জল তারপর তার জমিতে এল।

খুশিতে উপচে উঠল চাষীর মন! তার এতক্ষণের চেষ্টা সার্থক হল। এক দৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বাড়ি ফিরে বউকে বলল—নাও, এবার তেল দাও, আর একটু তামাক সাজো।

চাষী-বউ তেল দিল। চাষী তামাক খেয়ে চান সেরে, খেয়ে নিয়ে, সুখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল। যে কাজ করার ছিল, তা হয়ে গেছে, এখন আর ঘুমোতে বাধা কিসের?

[যখনকার যে কাজ, তা তখনই করে ফেলা উচিত।]



।। বুকে লুকোনো রামনাম ।।

এক দেশে এক রাজা ছিল আর তার ছিল এক রানী। খুব সুখে দিন কাটে তাদের। প্রজারা যেমন রাজাকে ভক্তি করে ভালবাসে তেমনি রাজা রানীও তাদের ভালবাসে নিজের ছেলে মেয়ের মত। প্রজারাও তাই খুব সুখে দিন কাটায়। এভাবেই চলছে তাদের দিন।

রানী নিজে খুব সীতাপতি রামচন্দ্রের ভক্ত। দিনরাত রাম-নাম জপ করছে। রাজা কিন্তু এসবের ধার কাছ দিয়েও যান না। তিনি



তার রাজ্য, রাজত্ব আর প্রজা প্রতিপালন নিয়েই আছেন। রানীর মত ঐ সব নাম, গান, জপ, তপ করেন না। নিজে করেন না বটে তাই বলে রানীর কাজেও বাধা দেন না। রানীর কিন্তু এ নিয়ে খুব দুঃখ। রানী নিজে জীবনে যা চেয়েছিলেন করুণাময় পদ্মপলাশ লোচন সবই দিয়েছেন শুধু ঐ একটি ব্যাপার ছাড়া। রানীর খুব ইচ্ছে যে তার মত তার স্বামীরও শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণের উপর ভক্তি থাকুক। সীতাপতির নাম করুন। তার ধ্যান করুন। সময় না পান তো সারা দিনে অন্তত একবার করুন। এ নিয়ে রানী অনেক দিন অনেক বার

রাজাকে অনুরোধ করেছেন, তা রাজা গান করেন না। এটাই রানীর একমাত্র দুঃখ। এ ভাবেই চলছে। স্ত্রী যতই রামচন্দ্রের গুণগান করুন না কেন।

স্বামীর এতটুকু ভাবান্তর দেখা যায় না। যেন এক কান দিয়ে বউয়ের কথা শোনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়।

রাজাকে নিস্পৃহ দেখে রানী এবার রামচন্দ্রের কাছেই মিনতি করে—হে রামচন্দ্র, তুমি তো বড় দয়াময়। তোমার দয়া হলে বাচাল মূক হয়, পঙ্গুও পর্বত পার হয়ে যায়। তুমি আমার স্বামীর সুমতি দাও, তাঁর মুখে একবার তোমার নাম উচ্চারিত হোক।

আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রের সুন্দর মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে প্রতি দিন এভাবে চোখের জল ফেলে রানী। মুখ তার মলিন হয়ে থাকে সব সময়।

সেদিন কি হল, দেখা গেল, সকাল থেকেই রানী খুব খুশি। দেওয়ানকে খবর দিল—আজ গোটা নগরীতে আনন্দোৎসব হবে। আলোয় আলোময় হোক প্রতিটি বাড়ি, সবচেয়ে সুন্দর আতসবাজি পোড়ানোর ব্যবস্থা হোক রাতে। ব্রাহ্মণদের খবর দিন, তাঁরা ভোজন করুন। গোটা রাজ্যের ভিখারিদের খবর দিন, রাজবাড়িতে আজ উৎসব। তারা আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুক। সুবর্ণমুদ্রা দিয়ে তাদের বিদায় দিন।

এত সব করার ফর্দ, অথচ কারণ তো কিছুই জানা নেই। দেওয়ান হাতজোড় করে বলল—অপরাধ নেবেন না রানীমা। আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন জানবেন, প্রতিটি ইচ্ছাই পূরণ হবে। কিন্তু রাজামশাইকে তো খরচের কারণ জানাতে হবে, দয়া করে যদি উৎসবের কারণটা জানান।

রানীর মুখ গম্ভীর হল। দেওয়ানকে সে কোনই কারণ জানাল না। শুধু বলল—আমার হুকুম। রাজা যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এই কথাই বলবেন।

দেওয়ান আর কথা বাড়ালেন না। রানী বলে কথা! কোন্ কথার কি মানে করেন, ঠিক আছে? তার চেয়ে হুকুম তামিল করাই ভালো।

যথারীতি খুব ধূমধাম করে উৎসবের আয়োজন হল। রাজবাড়ির উঠোনে বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হল। দোরে বসানো হল সানাই। দলে দলে ব্রাহ্মণরা খেয়েদেয়ে খুশি মনে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল। শত শত ভিখারি রাজবাড়ির ভুরিভোজ খেয়ে আর দান হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে রানীর জয়গান করতে করতে রাজবাড়ি ছেড়ে গেল।

রাজা তো সব দেখেশুনে অবাক। কিছুতেই বুঝতে পারেন না কিসের জন্য রাজ বাড়িতে এত আয়োজন। শেষে রানীকেই জিজ্ঞেস করে—এ কিসের সমারোহ! এত ঘটা কিসের?

রানী তো প্রথমে কিছুতেই বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর বলল—কাউকে বলি নি, কিন্তু তোমাকে বলতে কোন আপত্তি নেই, আজ আমার সবচেয়ে বড় শুভ দিন। কাল রাতে স্বপ্নে তুমি একবার রাম-নাম করে ফেলেছ। এতদিন শত অনুরোধ করেও যে নাম তুমি উচ্চারণ কর নি, কাল ঘুমের ঘোরে তোমার মুখ থেকে সেই শব্দই উচ্চারিত হয়েছে। তাই আজ আমি এই উৎসবের আয়োজন করেছি।

রাজামশাই শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার ধপাস করে বসে পড়লেন। গোটা চোখেমুখে ফুটে উঠল বেদনার একটা ভাব। বোঝাই গেল, খুব দুঃখ পেয়েছেন তিনি। বেদনামাখা গলায় বললেন —কি বললে, রাম-নাম উচ্চারণ করেছি? আমি? ঘুমের ঘোরে মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে? যে নাম এতদিন বুকের মধ্যে কত যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম, নিজেরই অসাবধানতায় তা বেরিয়ে গেল? ভগবান এ কি করলে তুমি! যা ছিল আমার একমাত্র একার, তাই হয়ে গেল আজ সবার।

বলতে বলতেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন রাজা।

রানী তাকে ধরার আগেই মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। রানীর তখন কি অসহায় অবস্থা। চিৎকার করে লোকজন ডেকে এনে রাজাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর রাজার জ্ঞান এলো, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সামনে রানী দাঁড়িয়ে, তার দিকে তাকিয়েই মুখ নিচু করলেন রাজা। ধরা পড়ে গেছেন আজ। এতদিন মুখে স্বীকার না করলেও তিনি মনে মনে ছিলেন প্রচণ্ড রামভক্ত। তার ভক্তি অনেকের চেয়ে বেশি।

[প্রকৃত ভক্ত সব সময় নিজেকে সবার মধ্যে প্রকাশ করতে চান না।]



॥ সবুরে মেওয়া ফলে ॥

বড় কৃপণ এক রাজা।

বিরাট বড় রাজ্য তাঁর, ধনদৌলতও অনেক—কিন্তু রাজা তা খরচ করতে নারাজ। এক পয়সার মা-বাপ। পারলে পিঁপড়েকে চেপে ধরে, যেটুকু চিনি খেয়েছে তা চেপে বের করে নেবেন।

অন্য রাজা হলে এই বয়সে রাজকাজ ছেড়ে দিতেন ছেলের ওপর। এ রাজা যথেষ্ট বুড়ো হয়েছেন, রাজকাজ দেখবার ক্ষমতাও প্রায় নেই, কিন্তু ছেলের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিতে তিনি নারাজ। ছেলে বড় হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে, তাতে কি? রাজ্য হাতে পেলে ছেলে যদি পাছে বেশি খরচ করে ফেলে? মেয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু তার বিয়ে দিতে গেলেই বেরিয়ে যাবে অনেক টাকা। তাই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেও রাজা উদাসীন। কিছুই ভাবতে চান না খরচ করার ভয়ে।

এভাবেই দিন চলছে। এর মধ্যে সেই রাজ্যে এল দুই নর্তক-নর্তকী। তাদের বড় সাধ, রাজাকে নাচ দেখায়।

রাজা শুনলেন তাদের কথা। এ দেশে তারা এসেছে, রাজাকে নাচ দেখাবে বলেই। এত বড় নাচিয়ে, না দেখলে রাজার মান থাকে না। কিন্তু তার পরের কথা ভেবেই তো মুষড়ে পড়েন রাজা। ওদের নাচ দেখতে গেলেই আসর বসাতে হবে, আর আসর বসালেই তো এক গাদা খরচ। রাজা তাই এক কৌশল করলেন। সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে—এমন একটা ভাব করলেন। নাচের ব্যাপারে সরাসরি 'না' বললেন না, আবার আসরও বসালেন না। হচ্ছে—হবে—বলে ঠেকিয়ে রাখলেন।

দিন যায়, নাচের আসর আর বসে না।

তাই নর্তক-নর্তকী এসে ধরল মন্ত্রীকে—অনেক দূর থেকে অনেক আশা নিয়ে এসেছি মন্ত্রীমশাই। আপনাদের রাজার সামনে একবার নাচ দেখাব, একটা ব্যবস্থা করে দিন।

কৃপণ রাজার মন্ত্রী তো, তিনিও ঠিক সেই রকম। নর্তক-নর্তকীর কথা শুনে ভাবল, এরা তো শুধু নাচ দেখাবার কথা বলছে, পয়সার কথা বলে নি। তাই বিনা পয়সায় নাচ মন্দ কি?

মন্ত্রী গিয়ে কথাটা বলল রাজাকে—আপনার কিছু খরচ হবে না রাজামশাই, আপনি আসর ডাকুন।

কিছু খরচ হবে না জেনে রাজা এবার আশ্বস্ত হলেন। বললেন—তাহলে আসর জমাও। দিন ঠিক কর। ঢেঁড়া পিটিয়ে দাও।

ঠিক দিনে নাচ শুরু হল। আসরে তিল ধারনের জায়গা নেই। রাজা এসেছেন, তাঁর মন্ত্রীরা এসেছেন, সভাসদেরা এসেছেন। এসেছেন নিমন্ত্রিত অতিথিরা। দারুণ জমজমাট আসর।

রাতের প্রথম প্রহরে শুরু হল তামাশা। নর্তকী নাচছে, আর নর্তক তাল বাজাচ্ছে।

এক একটা নাচ শেষ হয়, আর নর্তকী তাকায় এদিক ওদিক, যদি কোন দিক থেকে কেউ খুশি হয়ে টাকা ছুঁড়ে দেয়।

কিন্তু হায়, এক কাণাকড়িও কেউ ছুঁড়ে দিল না।

আবার নর্তকী শুরু করে নাচ, নর্তক ঢোল তুলে নেয়। আবার আশা। এবার কেউ যদি কিছু দেয়। কিন্তু না, কেউই কিছু দেয় না। মাঝখান থেকে নর্তকীর হতাশা শুধু বাড়ে।

নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে নর্তকী।

রাতের দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেল—তবু একটা পয়সা আয় হল না। তবু আশার তো শেষ নেই, আবার তাল বাজাল নর্তক। তৃতীয় প্রহর কেটে গেল, রাতের শেষ প্রহরও প্রায় যায় যায়। নর্তকী বুঝি এবার হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে। ম্লান গলায় নর্তককে বলল—রাত তো প্রায় শেষ হতে চলল। শরীর নুয়ে পড়েছে, তবু একটা ফুটো পয়সাও মিলল না এ পর্যন্ত। হে নর্তক, বৃথাই তুমি তাল বাজাচ্ছ। একটা পয়সাও কেউ দিচ্ছে না, বাজিয়ে কি হবে।

পয়সা না পেয়ে নর্তকও বেশ হতাশ হয়েছিল। কিন্তু নর্তকীর মত একেবারে ভেঙ্গে পড়ল না সে। নর্তকীকে বলল—রাতের অনেকটাই কেটে গেছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু এখনো পুরো রাত

কাবার হয় নি। প্রদীপে খানিকটা তেল রয়েছে; সম্পূর্ণ পুড়ে যায় নি মোমবাতি। তাই হেরে যেও না, তালে ভঙ্গ দিও না। নেচে যাও, আমিও বাজিয়ে যাই।

সকলকে শুনিয়েই নর্তক কথাগুলো বলল নর্তকীকে।

তার কথা শুনে যেন অঘটন ঘটে গেল। দর্শকদের মধ্যে ছিল এক সাধু ফকির। সে তার একমাত্র সম্পত্তি কম্বলখানা দিয়ে দিল নর্তকীকে। যুবরাজ তার হাত থেকে খুলে দিল সোনার বালা, আর রাজকুমারী তার গলা থেকে খুলে দিল রত্নমালা।

রাজা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। যুবরাজ আর রাজকুমারী এমন উদারতা দেখাল? ইস্, এতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল নাচ দেখতে এসে!

কিন্তু সকলের সামনে তো আর যুবরাজ আর রাজকুমারীকে সে কথা বলা যায় না। রাজা তাই সাধুকেই জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার, আপনি আপনার কম্বলটা দিয়ে দিলেন? এটাই তো একমাত্র সম্বল ছিল আপনার।

সাধু বললেন—মহারাজ, নর্তকের একটা মন্ত্র আমার চোখ খুলে দিল নতুন করে।

মন্ত্র? রাজা অবাক। নর্তক তো নর্তকীকে কিছু কথা বলল, সে মন্ত্র বলল কোথায়?

সাধু বললেন—হাঁ, মন্ত্রই তো। ঐ যে বলল, তালে ভঙ্গ দিও না, ওটাই তো মন্ত্র। সেই ছেলেবেলা থেকে সাধু হয়েছি। বয়স বাড়তে বাড়তে এখন বুড়ো হয়ে গেলুম। কি কষ্টের জীবন, আর ভালো লাগে না। তাই ঠিক করেছিলুম, আর নয়, এবার সাধুগিরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাব গৃহীজীবনে। জীবনের শেষ কটা দিন আরামে কাটাব। এমন সময় শুনলাম নর্তকের এই মন্ত্র। অনেক গেছে, আর অল্পই আছে—তবু আছে তো। কে জানে, সেই অল্পই হয়ত অনেক হয়ে উঠবে। এতদিন যা পাই নি, এবার হয়ত শেষের দিনে তা পেয়ে যাব। তাই তালে ভঙ্গ দিও না। নেচে যাও, বাজিয়ে যাও। মহারাজ, এই কথাটা আবার আমার মনকে শক্ত করেছে। ঠিক করেছি,

গৃহী জীবনে আর ফিরব না। যেমন সাধুগিরি করছিলাম, তেমনি করব। এত বড় সত্য যে দেখাল রাজা, তাকে কম্বলটা দেব না? হাতে আরও কিছু থাকলে তাও দিয়ে দিতাম।

—আর তুমি? রাজা জিজ্ঞেস করলেন যুবরাজকে।

যুবরাজ বললেন—মিথ্যে বলব না পিতা আপনার রাজপদ আঁকড়ে থাকা আমার ভালো লাগছিল না। ঠিক করেছিলাম, আপনি নিজে যখন সিংহাসন ছাড়বেন না, তখন আপনাকে হত্যা করে আমি সিংহাসনে বসব। এমন সময়ে নর্তকের কথাটা কানে এল। ভাবলাম, আপনি আর ক'দিনই-বা বাঁচবেন? তাহলে এই সামান্য কটা দিনের জন্য আপনাকে মেরে পাপ করি কেন? যেমন দিন চলছে, চলুক না। এত বড় একটা মন্ত্র যে আমায় দিল, বলুন পিতা, তাকে বালা দিয়ে আমি কি ভুল করেছি?

—আর তুমি? এবার রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

রাজকন্যা বললে—আমার বিয়ে করার খুব ইচ্ছে হয়েছে পিতা, কিন্তু আপনার মতিগতি দেখে বুঝেছিলাম, আপনি আমার বিয়ে দেবেন না। তাই ঠিক করেছিলাম, পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। এমন সময় শুনলাম ঐ মন্ত্র, অনেক গেছে, অল্পই আছে—কিন্তু ঐ অল্পের জন্য পাপ করো না। আপনার বয়স হয়েছে বাবা, ক'দিনই-বা আর বাঁচবেন আপনি মরে গেলে দাদা আমার পাত্র দেখবে। নিশ্চয়ই রাজার ছেলের সঙ্গে তখন বিয়ে হবে আমার। মান-সম্মান সব বজায় থাকবে, কারণ এখন বিয়ে করলে তো আর রাজার ছেলে পাবো না। মন্ত্র আমার চোখ খুলে দিয়েছে, আমায় অপেক্ষা করতে শিখিয়েছে, তাই ওদের রত্নমালা দিয়েছি।

তিনজনের কথা শুনে রাজার যেন জ্ঞান ফিরল। এতদিন কৃপণ হয়ে ছিলেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে, এবার যেন আলোয় ভরে উঠল চারদিক। সিংহাসন ছেড়ে দিলেন রাজপুত্রকে। সুপাত্র দেখে মেয়েরও বিয়ে দিলেন ধূমধাম করে। দুহাত ভরে পুরস্কার দিলেন নর্তক-নর্তকীকে, আনন্দের সাথে তাই গ্রহণ করল তারা। সভার সকলে ধন্য ধন্য করলেন।

[কোন কাজ করে সাথে সাথেই তার ফল লাভ অনেক সময়ে হয় না। তার জন্য হতাশ হওয়া উচিত নয়। যারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তারা ঠিক লাভবান হয়।]



॥ দিব্যদর্শন ॥

বুদ্ধ গৌতম। সারা জগতের মণি। দুঃখ কি, তা জানেন না। তাঁকে দেখলে সব দুঃখ কোথায় যেন চলে যায়। আনন্দে ভরে ওঠে মন প্রাণ।

তাই তো দলে দলে মানুষ এসে তাঁর শিষ্য হচ্ছে। খুব সাধারণ লোক থেকে রাজা পর্যন্ত। সকলের এক কথাঃ বুদ্ধ, তুমি জ্ঞানী, আমরা অজ্ঞান। আমরা তোমার শরণ নিলাম, তুমি আমাদের রক্ষা করো। জগতের যা কিছু দুঃখ কষ্ট যেন তার উর্ধ্বে উঠতে পারি, তার ব্যবস্থা করো।

বুদ্ধ কিন্তু এত সম্মান পেয়েও নিরাসক্ত। মানুষকে তেমনি বিলিয়ে চলেছেন প্রেম। যে তাঁর কাছে আসতে চাইছে, তাকেই কোল দিচ্ছেন।

ফিরছিলেন বৈশালী থেকে রাজগৃহে।

দেখলেন নগরের প্রায় শেষ দিকে এক ব্রাহ্মণ চাষা খুব আনন্দ-উৎসব করছে তার ঘরে। নাচ-গান, পান-ভোজনের ঢালাও আয়োজন। বহু লোক এসেছে তার বাড়িতে, আরও আসছে। বিরাট ব্যাপার।

কি ব্যাপার? খবর নিলেন বুদ্ধ।

চাষার ঘরে নতুন ফসল উঠেছে, গোটা কয়েক গোলা ভর্তি হয়ে গেছে, তাই এই আনন্দ-উৎসবের আয়োজন।

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বুদ্ধ এসে দাঁড়ালেন উৎসবমুখরিত সেই বাড়ির দুয়ারে। পড়বি তো পড় একেবারে সেই বাড়ির মালিক ব্রাহ্মণের মুখোমুখি। বললেন—ভিক্ষা দাও।

—ভিক্ষে? ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কথা শুনেই যেন ক্ষেপে উঠল—চালাকি পেয়েছ? কত কষ্টে জমি চষে ঠিকমত সময়ে বীজ বুনে কত পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েছি, আর তুমি কিনা এতটুকু না খেটে আমাদের রক্ত জল করে তৈরি করা ফসলে ভাগ বসাতে এসেছ? লজ্জা করে না

তোমার ? ঘরে ফিরে যাও, চাষ কর, বীজ বোনো, পরিশ্রম করে ফসল ফলাও। ভিক্ষে করো না।

ব্রাহ্মণের বিশ্রি ব্যবহারে বুদ্ধ কিন্তু এতটুকু রাগলেন না। শান্তভাবে বললেন—বন্ধু, আমিও জমি চাষ করি, বীজ বুনি।

ব্রাহ্মণ তবু তাচ্ছিল্য করল বুদ্ধকে। বলল—অমন কথা সব ভিক্ষুই বলে। তুমি দেখাতে পারো এসব ? কোথায় তোমাব জমি, আর কোথায় তোমার চাষ। বিশ্বাস করব যদি দেখাতে পার।



—পারি। বুদ্ধ বললেন—এসো আমার সঙ্গে।

খানিক দূরেই নাট্যশালা। ব্রাহ্মণকে নিয়ে বুদ্ধ হাজির হলেন সেখানে।

নাট্যশালায় তখন উপচে-পড়া ভিড়।

হবেই তো। রঙ্গমঞ্চে তখন নাচছে নগরের প্রধান নর্তকী কুবলয়। সেই নাচ দেখার ভিড়।

কি সুন্দর নাচছে কুবলয়। আর কি সুন্দরী সে। সকলের চোখ তারই দিকে, একটু দূরে যে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে অনুপম সুন্দর বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে কারুর খেয়াল নেই।

নাচ দেখছে এত মানুষ ? ক্রমে অহঙ্কার বাড়ে কুবলয়ের। নাচতে নাচতে কুবলয় হঠাৎ সকলের দিকে তাকিয়ে গর্বভরে বলল—আমার মত সুন্দরী আর কাউকে দেখেছ তোমরা ? বলো ?

সবাই চুপ। সত্যিই তো, কুবলয় এ নগরের সেরা সুন্দরী। তাই তার কথার প্রতিবাদ করবে কে?

সহসা গম্ভীর এক কণ্ঠ ভেসে ওঠে জনতার মধ্য থেকে—আমি দেখেছি। আর সে তোমার চেয়ে হাজারগুণ সুন্দর।

কে? কে বলে এমন কথা? জনতা তাকায় বক্তার দিকে। মুণ্ডিতমস্তক এক ভিক্ষু। কি সুন্দর স্বর্গীয় পবিত্রতা লেগে আছে সারা মুখে।

তেরছা চোখে কুবলয় তাকায় ভিক্ষু বুদ্ধের দিকে—বটে? আমার চেয়েও সুন্দরী? হু!

বুদ্ধের কথার এতটুকু দাম না দিয়ে আবার নাচ শুরু করে সে।

জনতা কিন্তু বুদ্ধকে ছাড়ে না—ভিক্ষু বলে যা ইচ্ছে তাই বলবে, ভেবেছ নাকি? বলেছ যখন, তখন দেখাতে হবে আমাদের কুবলয়ের চেয়ে হাজার গুণ সুন্দরী সেই নারীকে।

বুদ্ধের মুখে কিন্তু তখনও নির্মল হাসি। জনতার শাসানিতে এতটুকু ভয় পান নি তিনি। বললেন—বেশ, দেখাচ্ছি এখুনি।

বুদ্ধ এবার তাকালেন কুবলয়ের দিকে। চোখের আর পলক পড়ে না।

কুবলয় তো নাচতে নাচতে হেসেই অস্থির। আমার চেয়ে সুন্দরী নারী দেখাবে? পাগল কোথাকার!

কিন্তু এ কি! এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!

বুদ্ধ তাকিয়ে আছেন, আর একটু একটু করে কুবলয় বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। মাথার অমন সুন্দর কালো চুলে পাক ধরল, অমন সুন্দর সাজানো দাঁতগুলো পড়ে গেল একে একে, ভরাট দুই গাল কোথায় মিলিয়ে গিয়ে গভীর গর্ত হয়ে গেল। কোটরে চলে গেল দু চোখ। শরীরের অমন সৌন্দর্য কোথায় মিলিয়ে গিয়ে কুবলয় কঙ্কালসার হয়ে গেল। তাই দেখে কেউ ভয়ে দু চোখ বুঁজল, কেউ রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে পালাল।

সুন্দরী কুবলয় অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের পরিবর্তন দেখে।

কি বলবে বুঝে উঠতে না পেরে বোবার মত তাকিয়ে রইল ভগবান বুদ্ধের দিকে।

বুদ্ধের মুখে তখনও সেই প্রশান্ত হাসি। যে হাসি দেখলে চোখ জুড়োয়, মন ভরে যায়। বললেন—কুবলয়, এবার আয়নায় নিজেকে দেখ। দেখ, আগের চেয়ে কত হাজার গুণ সুন্দরী হয়ে উঠেছো তুমি। আগে তোমার শরীর ঘিরে ছিল যৌবন। আর মনে ছিল অহঙ্কার। যৌবন তো একটা মায়া, কদিন থাকে। এখন বেরিয়ে পড়েছে তোমার আসল শরীর, আসল রূপ। এর লয় নেই, ক্ষয় নেয়। যৌবনের আগুন নেই এতে, নেই কোন অহঙ্কারের ছাপ। কিন্তু তাকিয়ে দেখ, কেমন সুন্দর একটা প্রশান্তির ছাপ আছে এতে।

এতদিনে কুবলয় সত্যি কথাটা বুঝল। মানুষের রূপ-যৌবন-সৌন্দর্য সবই ক্ষণস্থায়ী। সৌন্দর্য শরীরে নেই, আছে মনে। দেখতে যে সুন্দর, সে সুন্দর নয়। মন যার সুন্দর, সেই প্রকৃত সুন্দর।

কুবলয় লুটিয়ে পড়ল বুদ্ধের পায়ে। বলল—আমাকে দয়া কর প্রভু। তুমি আমাকে আমার আসল রূপ দেখিয়েছ, এতদিনে আমি চিনতে পেরেছি নিজেকে। এবার তুমি আমাকে তোমার পদতলে জায়গা দাও।

আপত্তি করলেন না বুদ্ধ। করবেন কেন? মানুষের চোখই তো তিনি ফোটাতে এসেছেন। যেন তারা মিথ্যে মোহের পেছনে না ছোটে। চিনতে পারে সত্যকে। কুবলয় যখন সেই সত্যকে উপলব্ধি করেছে তখন তাকে জায়গা দিতে আপত্তি কিসের।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ব্রাহ্মণ চাষী। সে পুরো ব্যাপারটাই দেখেছিল। সেও লুটিয়ে পড়ল বুদ্ধের পায়ে। বলল—প্রভু, আমাকেও ডেকে নাও তোমার চাষের কাজে। তোমার চাষে আমাকেও চাষী করো।

[শরীর সুন্দর হলেই সুন্দর হয় না। যার মন সুন্দর সেই প্রকৃত সুন্দর।]



॥ শেখার জিনিস ॥

এক অবধূত মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। একটু তাড়া-তাড়িই পথ চলেছিলেন তিনি। একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে।

হঠাৎ ঢাকঢোলের আওয়াজ তাঁর কানে এল। এক বর চলেছে। সঙ্গে ছোট্ট এক শোভাযাত্রা। বাজিয়েরা বাদ্য বাজাতে বাজাতে চলেছে। চারপাশের লোকজন কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে আসছে সেই শোভাযাত্রা দেখতে। বাচ্চারা তো দৌড়ে বেরিয়ে আসছে, বড়দেরও কৌতূহল কম নয়। তারাও নিজেদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

অবধূত সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, এত হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও এক ব্যাধ তার লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সামনে যে এত জাঁকজমক, হৈ-হট্টগোল কিছুই যেন তাঁর কানে যাচ্ছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে মনে মনে প্রণাম করে বললেন —প্রভু, আপনিই আমার গুরু। আমি যখন ধ্যানে বসব তখন যেন ঐ রকম লক্ষ্যই থাকে।

অবধূত এগিয়ে গেলেন আরও খানিকটা পথ।

সামনে একটা ছোট পুকুর। একটি লোক পুকুরের পাড়ে বসে মাছ ধরছে। অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা ভাই, অমুক জায়গায় যাব। কি ভাবে, কোন্ পথে গেলে আমার সুবিধে হবে, বলতে পারেন ?

ভেবেছিলেন, উত্তর পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু উত্তর এল না। লোকটি তখন এক মনে মাছ ধরে যাচ্ছিল। তার ফাৎনায় সে সময় মাছ খাচ্ছে, তাই তার লক্ষ্য এবং মন দুই-ই তখন ঐ দিকে। উত্তর না পেয়ে অবধূত কিন্তু রাগ করলেন না এতটুকু, বরং তিনিও লক্ষ্য করতে লাগলেন লোকটির কাণ্ডকারখানা।

ফাৎনাটা জলে ডুবতেই লোকটা ছিপে দিলে এক টান।

লক্ষ্য নিখুঁত, সঙ্গে সঙ্গে বড়শিতে গাঁথা অবস্থায় উঠে এল একটা মাছ। লোকটা খুব খুশি। এতক্ষণ সে দেখতেই পায় নি পাশে দাঁড়ানো অবধূতকে। এবার তার সেদিকে নজর পড়তেই একটু লজ্জিত ভাবে বলল—কিছু মনে করবেন না, আপনি কি আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করেছেন?

অবধূত তখন তার কথায় উত্তর দেবেন কি, তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন ব্যাধের একাগ্রতা দেখে। লোকটিকে তিমি প্রণাম করে বললেন—আপনি আমার গুরু। আমি যখন পরমাত্মার ধ্যানে বসব, তখন যেন ঠিক এভাবেই নিজের কাজ শেষ না করে অন্যদিকে মন না দিই।

লোকটির কাছ থেকে পথের নিশানা নিয়ে অবধূত এগিয়ে চলছিলেন। এবার পথে পড়ল বিরাট একটা দীঘি। সেই দীঘির পাড়ে বসে আছে একটা বক। কোন দিকে তার খেয়াল নেই—সে চুপটি করে বসে আছে। লক্ষ্য তার মাছ, তার ঠিক পাশে ব্যাধের উপস্থিতি সে দেখেও দেখছে না। অবধূতেরও কোন দিকে খেয়াল ছিল না, তিনি লক্ষ্য করছিলেন বককে।

ছোঁ মেরে একটা মাছকে তুলে নিয়ে গেল বকটি। লক্ষ্য স্থির রেখে সে ঠিক কাজ হাসিল করেছে। এবার একটু দূরে বসে মনের আনন্দে মাছ খেয়ে চলেছে।

অবধূত সেই বকটিকে প্রণাম করে বললেন—তুমি আমার গুরু। আমি যখন ধ্যানে বসব, তখন যেন ঠিক তোমার মতই একাগ্রচিত্ত হই, সামনে বা পেছনে যেন না তাকাই।

দীঘির অন্য পাড়ে তখন আর একটি মজার ঘটনা ঘটল। দীঘি থেকে একটা মাছ ধরে একটা চিল উড়ে যাচ্ছে, আর তার পেছন পেছন অনেকগুলো কাক আর চিল তার পেছনে ঠুকরে কামড়ে বিরক্ত করে ঐ মাছটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। চিলটা যেদিকে যায়, সব কাক আর চিলগুলোও চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছন পেছন যায়।

অবিরাম তাড়া আর পেছন-ঠোকরানিতে বিরক্ত হয়ে প্রথম চিলটা

এবার মুখ থেকে মাছটা ফেলে দিল। অমনি আর একটা চিল এসে সেটা মুখে তুলে নিল। অন্য কাক-চিলগুলো এবার প্রথম চিলকে ছেড়ে লেগে পড়ল দ্বিতীয় চিলের পেছনে।

প্রথম চিলটি কিন্তু এবার নিশ্চিন্ত মনে একটা গাছে বসে রইল। আর তার পেছনে কেউ লাগছে না। মুখ থেকে মাছ ফেলে দিয়ে সে পরম নিশ্চিন্ত। অবধূত তার সেই নিশ্চিন্ত নিরাপদ ভাব লক্ষ্য করে তাকে প্রণাম করে বললেন—চিল, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। এবার আমি বুঝলুম, সংসারের ভার ফেলে দিতে পারলেই শান্তি; নইলে মহা বিপদ।

[শেখার মন থাকলে পৃথিবীতে সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু শেখার আছে।]



ত্যাগী কে ?

ঘুরতে ঘুরতে এক সাধু এলেন এক রাজার কাছে।

রাজা তাঁকে দেখে খুব খুশি। ইনি তো যে-সে লোক নন। ত্যাগী পুরুষ। ভগবানকে শুধু মানেন, তাঁকে পাবার কথা দিনরাত চিন্তা করেন। আর কিছু জানেন না, মানেন না। এই জন্য ভোগ, ঐশ্বর্য সব ত্যাগ করেছেন।

রাজা জানেন এসব কথা। এ জন্যই অন্য লোকের চেয়ে সাধুকে একটু বেশি খাতির করেন। পরম সমাদরে বসতে দেন তাঁকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, কথা বলে তৃপ্তি পান।

সেদিন কথা হচ্ছিল রাজার সঙ্গে সাধুর। এক একদিন এক একটা প্রসঙ্গে আলোচনা ওঠে। সেদিন উঠেছিল কে বড় ত্যাগী, এই প্রসঙ্গ।

রাজা বললেন—আপনিই বড় ত্যাগী। ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভোগ-ঐশ্বর্য সব ত্যাগ করেছেন। বড় ত্যাগী না হলে কি তা সম্ভব হতো ?

সাধু বললেন—না-না, আপনি আমার চেয়ে অনেক বড় ত্যাগী।

রাজা তো অবাক সাধুর কথা শুনে। বললেন—বলেন কি ! আমি এমন বিলাসের মধ্যে থাকি, এত সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করি। আর আপনি ! আপনি তো সব ত্যাগ করেছেন, এতটুকু বাসনা নেই, কামনা নেই। তাহলে আমি কি করে আপনার চেয়ে বড় ত্যাগী হলুম।

সাধু হেসে বললেন—অনেক ভেবেচিন্তেই আমি কথাটা বলেছি রাজা। যে সবচেয়ে দামী জিনিস বা প্রিয় জিনিস ত্যাগ করে, সে-ই তো বড় ত্যাগী। আমি তো কতকগুলো তুচ্ছ জিনিস ত্যাগ করেছি, ভোগ আর ঐশ্বর্য। কিন্তু আপনি ? আপনি ত্যাগ করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিসকে, ত্যাগ করেছেন সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে। পরমাত্মা

হল সবচেয়ে দামী জিনিস। আপনি সেই সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে কত সহজে ত্যাগ করেছেন। তাই আমার চেয়ে অনেক বড় ত্যাগী আপনি। বলুন, তাই নয় কি?

সাধুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন রাজা।

বুঝলেন, ভোগসুখ উপভোগ করতে গিয়ে সবচেয়ে দামী যে পরমাত্মা, তাকে কিভাবে অবহেলা করেছেন। দরকার নেই এ রাজসুখের, তিনিও সব ছেড়ে সাধু হতে চান।

সাধুর কথায় তাঁর চোখ খুলে গেছে। এতদিন ভোগ সুখ বিলাসের মধ্যে ডুবে অন্ধ হয়েছিলেন। ভুলেছিলেন ঈশ্বরের নাম গান। মনস্থির করলেন, এ ভুল তাঁর আর হবে না। ত্যাগ নয় গ্রহণ করবেন পরমাত্মা নিজের আপন করে।

[ভোগের মধ্যে সুখ নেই, প্রকৃত সুখ আছে ত্যাগে।]

———



প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ॥ কুইক প্রিণ্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯